সকল ধর্মই ইসলাম

সকল ধর্মই ইসলাম–২

সকল ধর্মই ইসলাম–৩

সকল ধর্মই ইসলাম–৪

নাজিম উদ্দিন আহমেদ (ফারুক)

প্রকাশক : নাজিমউদ্দিন আহমেদ (ফারুক)
গ্রাম : চুনকুটিয়া (আমিনপাড়া)
পোস্ট : শুভাঢ্যা, থানা : দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০
স্বত্ব : লেখক
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : ২০২২

প্রাপ্তিস্থান

ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া পাবলিশার
সুফীধারার পুস্তক সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র ৩৬/৫ বাংলাবাজার, (নীচতলা), ঢাকা। মোবাইল : ০১৬৩৩৭৯০৪৭৩,

শাহ্ আলী (র) মাজার শরীফ
মিরপুর সেকশান-১। মাজারের ভিতরে প্রতি বৃহস্পতিবার বই পাওয়া যায়। মোবাইল : ০১৬২২-৮১১৬৭৪/, ০১৭৯০-৬৫৯৫২৬

ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া লাইব্রেরী
হযরত সোলেমান শাহ্ (র) দরবার (হাজি মার্কেট) বেলতলী, মতলব, চাঁদপুর মোবাইল : ০১৯১৫-৮৪২৯৭৯

বাবুল স্টোর
বাগমারা মধ্য বাজার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা মোবাইল : ০১৮১৬-৭২৭৬৬৬

মুদ্রণ : মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৯০.০০ টাকা মাত্র

নালন্দা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৫২-৪৫৬৯১৯

ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া নেজামিয়া সংঘ
চুনকুটিয়া (আমিনপাড়া)
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০
মোবাইল : ০১৭১২-০২১৪০৫,

হেরাবন চিশ্‌তীয়া দরবার
১৩৪, পশ্চিম জুরাইন, তুলাবাগিচা
ঢাকা-১২০৪ মোবাইল : ০১৯১৫-৮৪২৯৭৯

চিল্লাঘর
দরবারে খাজা বারাহিগুণী দরবার শরীফ জয়লস্কর, দাগনভূঞা, ফেণী। মোবাইল : ০১৭৯০ ৬৫৯৫২৬

সৈকত স্টোর
চান্দিনা, পশ্চিম বাজার, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৫৫৫-০২৬২২৩

ISBN : 978-984-91188-8-6

ভূমিকা

ধর্ম না বুঝার কারণে ধর্মান্ধতা এবং অজ্ঞতা মানুষের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে। সকল ধর্মই যে মূলতঃ এক এবং ধর্মই যে মানব মুক্তির দিশারি তাহাই এই পুস্তিকায় তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

সকল ধর্মই মানুষকে নিজেকে চেনার পদ্ধতি শিখাইয়া অবতার মানুষে পরিণত করিয়া থাকে। অসুর মানবকে অবতারে পরিণত করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমরা নাম ধার্মিক মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি নানা দলে বিভক্ত হইয়া দলাদলি ও মারামারিতে লিপ্ত আছি এবং নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ দাবি করিয়া চলিয়াছি। জগতে ধর্ম লইয়া মারামারি খুনাখুনি করিয়া পৃথিবীকে মানব বাসের অনুপযুক্ত নরকে পরিণত করিয়াছি। এই পৃথিবীতে ধর্ম লইয়া যত অশান্তি এবং রক্তগঙ্গা বহিয়াছে এবং বহিতেছে অন্য কোন কিছু লইয়া তাহা হয় নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

স্রষ্টা যে মহাপ্রেম খেলা খেলিবার জন্য এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি (সৃজন) করিয়াছেন ইহা না বুঝিবার কারণেই সমাজে ধর্ম লইয়া যত অশান্তি। এই মহা সৃষ্টিতে তিনি নিজেই রূপে-রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। মানুষের মাঝে তিনিই যে চরমভাবে বিকশিত হন তাঁহারই জ্ঞান মহাপুরুষগণ (নবী, রসুল, অলি-আল্লাহগণ) জনসাধারণকে অবগত করাইতেছেন ধর্মরূপে। যাহাতে তাহারা মহাপ্রভুকে চিনিতে এবং জানিতে পারিয়া নিজেই মহাপ্রভুরূপের প্রতিচ্ছবি হইয়া যায়। মহামানব (মহাপুরুষ) তথা নবী, রসুল, অলি-আল্লাহ)গণই আল্লাহর চরম বিকাশ।

ইসলামের সার্বজনীনতা প্রমাণার্থে জনাব সদরউদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তীর লিখিত সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা সর্বেশ্বরবাদ, ও কিছু প্রবন্ধ ও বাণী এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল।

বিভিন্ন রাজা বাদশারা নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং জনগণকে হাতে রাখার জন্য নানাভাবে ধর্মকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার কিছু রূপ রেখা এখানে তুলিয়া ধরা হইল।

লেখক

নাজিম উদ্দিন আহমদ (ফারুক)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলাম

আসলেম থেকেই মুসলিম শব্দের উৎপত্তি। আসলেম বা আত্মসমর্পণকারীকে মুসলিম বলে। সমর্পণের ধর্মের নাম ইসলাম। নবী ও রসুলগণের নিকট আত্মসর্পণের নাম ইসলাম। আদম হইতে আজ পর্যন্ত যত নবী ও রসুল আসিয়াছেন সকলেই ইসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কাজেই দেখা যায় সকল ধর্মই ইসলাম ধর্ম। কোরানে আছে এমন কোন কাওম বা জাতি নাই; যেখানে নবী ও রসুল পাঠানো হয় নাই। যে ব্যক্তি ঈসা (আ.) এঁর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি ঈসাই মুসলিম। যিনি মুসা (আ.) এঁর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি মুসাই মুসলিম। যিনি বুদ্ধ (আ.) এঁর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি বুদ্ধিষ্ট মুসলিম। যিনি কৃষ্ণ (আ.) এঁর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি কৃষ্ণের মুসলিম। যিনি মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (আ.) এঁর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি মোহাম্মদী মুসলিম। অতএব প্রশ্ন থাকে যে, মুসলিম নয় কে? যুগে যুগে আল্লাহ নবী ও রসুলের মাধ্যমে মানুষের নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। আল্লাহর প্রচারিত যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই তাহাকে আল্লাহ মুক্তি দিতে বাধ্য। আর আল্লাহকে যদি এমেন্ডমেন্ট (তথা পরিবর্তনের) অধীন করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আল্লাহর আল্লাহিয়াত থাকে না। আল্লাহও আমাদের মত ভুল-ত্রুটির অধীন হইয়া পড়েন। সে ক্ষেত্রে এমন আল্লাহকে আল্লাহ বলিয়া মানা কঠিন হইয়া পড়ে। আল্লাহ তাঁহার বিধান যুগপোযোগী করার জন্য সর্বকালে নবী ও রসুলগণের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মূল আত্মসমর্পণের ধর্ম, 'এক ও অভিন্ন'।

সময়ের বিবর্তনে যে সকল ভুল-ত্রুটি ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে সেগুলোকে একটু সচেতন দৃষ্টিতে দেখিলে সহজেই এর ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়িবে।

হযরত মোহাম্মদ (আ.) বলিয়াছেন, "আনা মিন নূর আল্লা ওয়া কুল্লে সাইইন মিন নূরি" (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর হইতে এবং আমার নূর হইতে সমস্ত সৃষ্টি)। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মোহাম্মদী নূর তথা মোহাম্মদ হইতেই সমস্ত সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা মোহাম্মদেরই প্রকাশ বা প্রলম্বন রূপে রূপান্তরিত হইয়া মোহাম্মদ (আ.) ছুটিয়া চলিয়াছেন। **আমাদের মধ্যেও মোহাম্মদ (আ.) বীজ রূপে বিরাজিত। মোহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত। যিনি নিজেকে নূরে মোহাম্মদীর জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া প্রশংসিত করিতে পারিয়াছেন তিনিই মোহাম্মদ। সমস্ত সৃষ্টিই মোহাম্মদী নূরের বিকাশ।**

যিনি ঈসা (আ.)-এর অনুসারী তিনি ইহাকে ঈসাই নূর বলিবেন। যিনি মূসা (আ.) এর অনুসারী তিনি ইহাকে মূসাই নূর বলিলেন। যিনি কৃষ্ণ (আ.)-এর অনুসারী তিনি ইহাকে কৃষ্ণের নূর বলিবেন। যিনি বৌদ্ধ (আ.)-এর অনুসারী তিনি ইহাকে বুদ্ধিষ্ট নূর বলিবেন। মোট কথা সকল প্রশংসিত আলোকিত মহামানবের নূরকে এখানে মোহাম্মদী নূর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমাদের মধ্যেও মোহাম্মদী নূর বীজ রূপে বিরাজিত। জীব-জন্তু, পশু-পাখি সবই তাঁর নূরের বিকাশ। জীব-জন্তুদেরকে এই নূর চেনা বা জানার ক্ষমতা দেয়া হয় নাই। নিম্নমানের জীব মানুষের কাছে উৎসর্গিত হয় এবং মানুষকে আল্লাহর কাছে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য যোগ্যতা এবং জ্ঞান দ্বারা তৈরি করা হইয়াছে। যাহার দ্বারা সে আল্লাহকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে। আল্লাহকে চেনা ও জানার কর্মের নামই আল্লাহর ধর্ম।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ তথা মোহাম্মদগণ মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন। **মহাপুরুষগণ সবাই যে মোহাম্মদ তাহা হুজুর (আ.) এঁর একটি হাদিস দ্বারা জানা যায়। "আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, ওয়া আখেরুনা মোহাম্মদ, কুল্লানা মোহাম্মদ (আমাদের আদিতে মোহাম্মদ, মধ্যে মোহাম্মদ, শেষে মোহাম্মদ,**

আমরা সবাই মোহাম্মদ)।" "আদম, নূহ, কৃষ্ণ, ইয়াকুব ইত্যাদি আদি নবীগণ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ঈসা, মুসা, হুজুর (আ.) এঁর মত মধ্যে যাহারা তাঁহারাও মোহাম্মদ এবং পরবর্তীকালে যত গাউস, কুতুব, অলি-আল্লাহ সবাই আমরা মোহাম্মদ।" হুজুর (আ.) এঁর নাম অনুসারে এই নূরকে নূরে-মোহাম্মদী নাম রাখা হইয়াছে। কারণ তিনি মোহাম্মদী পরিষদের প্রেসিডেন্ট। আবার কোরানে বলা হইতেছে, "লামাউজুদা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই। **সৃষ্টিরূপে যাহাকিছু দেখিতেছি তাহা আল্লাহরই বিকাশ। আল্লাহ নূরে-মোহাম্মদরূপে সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাই আল্লাহ নিজেকে আহাদ আল্লাহ, সামাদ আল্লাহ, লা-শারিক আল্লাহ এই তিনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।** আহাদ আল্লাহ তথা অস্তিত্ব জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই– জীব-জন্তু, পশু-পাখি সবই সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল আমরা সকল দুর্বল মানুষ আহাদ জগতের অন্তর্ভূক্ত। যে সকল মানুষ তাহার ভিতরের বীজরূপী মোহাম্মদ তথা আল্লাহকে জাগ্রত করিয়া মহান হইয়াছেন তাঁহারা সামাদ আল্লাহ (যথা নবী, রসুল, অলি-আল্লাহ ইত্যাদি)। সামাদ শব্দের অর্থ মুক্ত, স্বাধীন, ভাসমান। নিস্কাম কর্মের মাধ্যমে সংস্কার রাশির উপর জয়ী হইয়া যাহারা ভাসমান হইয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে সামাদ আল্লাহ বলা হয়। লা-শারিক আল্লাহই নিরাকার আল্লাহ, লা-শারিক আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মানুষের কোন ধারণা নাই। একমাত্র সামাদ আল্লাহগণই লা-শারিক আল্লাহকে চিনিতে ও বুঝিতে এবং যোগাযোগ করিতে সক্ষম।

আমাদের সাধারণ মানুষকে লা-শারিক আল্লাহ, সামাদ আল্লাহর মাধ্যমে হেদায়েত ও সংযোগ দিয়া থাকেন। তাই সাধারণ মানুষের জন্য সামাদ আল্লাহগণই পূজনীয়। ওহাবী মতবাদ তথা বস্তুবাদী শক্তি ও বস্তুবাদী ধর্ম এই সামাদ আল্লাহদের অস্বীকারকারী। তাহারা সামাদ আল্লাহদের তথা নবী, রসুল ও অলি-আল্লাহগণকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করে। এই কারণে সমাজের বস্তুবাদী শক্তি ও বস্তুবাদী ধর্ম চিরদিন সামাদ আল্লাহদের অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। **মানুষের জন্ম মসজিদুল হারামে অর্থাৎ দুনিয়া হারাম অবস্থায়।**

আল্লাহর আল্লাহিয়াতের মাঝে প্রতিটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আস্তে আস্তে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে মসজিদুল হারাম অবস্থা হইতে ছুটাইয়া কাফের বানাইয়া ফেলে। ১৮ বৎসর পূর্ণ হইলে আমাদের প্রতিটি সন্তানই পরিপূর্ণ কাফের হইয়া যায়। কাফ্ফারা অর্থ ঢাকিয়া রাখা, আল্লাহ বা আল্লাহিয়াতকে যে বিষয়রাশি দ্বারা ঢাকিয়া রাখে সে-ই কাফের। যৌবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ একজন পূর্ণাঙ্গ কাফের হইয়া যায়। এই কাফের অবস্থা হইতে আবার আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য তাহাকে সচেষ্ট হইতে হয়। ইহাই আল্লাহর পরীক্ষা, তোমাকে যে অবস্থায় দুনিয়ায় পাঠান হইয়াছে (নিষ্পাপ নিষ্কলুষ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল শিশু) সেই অবস্থায় (সেই মানসিক হালে) ফিরিয়া যাও। এই লক্ষ্যে পৌঁছা মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন এবং দূরতম ব্যাপার। এই জন্য মসজিদুল আকসাকে দূরতম মসজিদ বলা হয়। কোথা হইতে দূরতম? মক্কা হইতে না মদিনা হইতে, ঢাকা হইতে না নিউইয়র্ক হইতে ইহার উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ ইহা মানব জীবনের দূরতম ব্যাপার (মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসা)। ধ্যান সাধনায় আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য কাফের অবস্থা হইতে শুরু করিলে ইহা তাহার জীবনের দূরতম ব্যাপার। এই জন্য মানুষের যাত্রা মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসা। প্রতিটি মানুষকে মসজিদুল আকসায় পৌঁছার জন্য মসজিদুল হারামের তথা দুনিয়া হারামের আমল করিতে হইবে। বাহ্যিক যাহাকিছু আমরা দেখি তাহা কোরানের দৃষ্টিতে দুনিয়া নয়। দুনিয়া মানুষের মনের লোভাতুর হাল বা অবস্থা। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে এই হাল হইতে উত্তরণ সম্ভব। মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসায় পৌঁছার পর মানুষের যাত্রা লা-মকামের দিকে। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই হুজুর (আ.) আল্লাহর সঙ্গে দর্শনের জন্য মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসায় গিয়া লা-মকামের দিকে যাত্রা করিলেন। একজন মানুষকে এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে ধ্যান সাধনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এইজন্য নবী মোহাম্মদ (আ.) ২৫ বৎসর বয়স হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত হেরাগুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জন্মগতভাবেই নবী। নূরে মোহাম্মদীর আঁধার বা ভাণ্ডার–এই ধ্যান সাধনা তাঁহার জন্য নয়। আমাদের সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, অন্তত পক্ষে ১৫টি বছর কেহ একাগ্র মনে চেষ্টা

করিলে সে 'লা' এর তথা আল্লাহ-প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবে। নবীরা জন্মগতভাবেই নবী, আল্লার সহিত সংযুক্ত। ইহার প্রমাণ ঈসা (আ.) ১ দিনের শিশু বলিতেছেন 'আমি নবী, আমার কাছে কেতাব নাজেল হইয়াছে, তোমাদের হেদায়েতের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।'

নবীরা জন্মগতভাবেই স্বশিক্ষিত। আল্লাহপাকের বিকাশ বিজ্ঞান ও বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডের সব জ্ঞান তাঁহাদের করায়ত্ব। জ্ঞান অর্জনের জন্য দুনিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে না।

বেকুবমূর্খ গোয়ার আরবজাতির কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলার জন্য হুজুর (সা.আ.)-কে নবুয়ত প্রচারের জন্য ৪০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা নিজেকে প্রকাশ করেন। সুরা বারাত ৯৭ আয়াত "আল আরাবু আশাদ্দুকুফরান ওয়া নেফাকান" আরবী লোকেরা কুফরী এবং মোনাফেকীতে খুবই শক্ত।

সুরা বারাত (৯ঃ৯৭ আরবী লোকেরা কুফরী এবং মোনাফেকীতে খুবই শক্ত এবং আল্লাহ তাঁহার রসুলের প্রতি যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহার সীমা না বুঝিবার (বিষয়ে) উপযুক্ত, এবং আল্লাহ বিজ্ঞানময় জ্ঞানী। **মোহাম্মদ (আ.) এঁর নিজের জন্য মেরাজ নয়। সাধারণ মানুষকে মেরাজ দান করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। "আস সালাতু মেরাজুল মোমেনীন" অর্থাৎ সালাত মোমিনের মেরাজ। আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ প্রচেষ্টার নাম সালাত (নামাজ ফারসি শব্দ)। আল্লাহর সহিত যোগাযোগের প্রচেষ্টা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া গেলে মোমিনের মেরাজ হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহ প্রাপ্তি হইয়া যায়।** আল্লাহতে পৌঁছাইবার জন্য মানুষকে অবশ্যই দুনিয়া হারামের সাধনা করিতে হইবে। এইজন্য ইয়াকুব নবী তাঁহার সন্তানদেরকে বলিয়াছেন "মুসলমান না হইয়া মরিও না"। কোন মহাপুরুষের (নবী, রসুল, অলি-আল্লাহ) নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার রঙে নিজেকে রাঙ্গাইয়া মরিবার জন্য তিনি আদেশ করিতেছেন। ইয়াকুব নবী নিজে নবী হইয়াও তাঁহার সন্তানদের এইরূপ শিক্ষা দিতেছেন। তিনি নিজে তো মুসলমান। তাঁহার সন্তানগণ জন্মগতভাবেই মুসলমান দাবীদার। তবে কেন তিনি তাঁহার সন্তানদের মুসলিম হইয়া মরিতে বলিতেছেন?

বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করিয়া এহরাম বস্ত্র পরা অবস্থায় নবী (আ.) সোয়ালক্ষ সাহাবীসহ মদিনায় রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে ১৮ জিলহজ ১০ হিজরি, ২১ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ গাদিরে খুম নামক স্থানে মাওলা আলী (আ.) কে অভিষিক্ত করিয়া (তাঁহার পরবর্তী নেতা নিয়োগ করিয়া) সোয়ালক্ষ সাহাবীকে আলীর (আ.) নিকট বায়াত করাইয়া মদিনায় ফিরিলেন। কিন্তু বস্তুবাদী শক্তি তাঁহার দেহত্যাগের পর বনি সাকিফায় মদিনা হইতে কিছুদূরের এক বসতিতে ক্ষুদ্র নির্বাচন করিয়া আবুবকর (রা.) কে নেতা নিয়োগ করিল। আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের উত্তরাধিকারী কখনই নির্বাচন করিয়া বানানো যায় না। আল্লাহ ও তাঁহার রসুলেরা একমাত্র সামাদ পর্যায়ের ব্যক্তিগণকেই তাঁহাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া থাকেন। সামাদ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ নবুয়ত তথা ইমামতের কার্যাদি সম্পাদনের একমাত্র অধিকারী। মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (আ.) এঁর দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহ মোবারক দেখিয়া আবুবকর (রা.) যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা হইল, "যাহারা মোহাম্মদের পূঁজা কর তাহারা জানিয়া রাখ মোহাম্মদ মরিয়া গিয়াছে। যাহারা আল্লাহর পূঁজা কর তাহারা জানিয়া রাখ আল্লাহ মরেন না, আল্লাহ চিরঞ্জীব।" যেখানে কোরান বলিতেছেন, "আল আউলিয়া উ-লা ইয়া মাওতু" আউলিয়াগণ মরে না। সেখানে আবুবকর মোহাম্মদ (আ.) কে মৃত ঘোষণা করিতেছেন। এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আবুবকর (রা.) মোহাম্মদী ইসলামকে বিপথগামী করার পথে প্রথম বাহ্যিক অনুষ্ঠান-ধর্ম পালনকারী, আধ্যাত্মবাদ বিরোধী ওহাবী, এবং হুজুর (আ.) কে আমাদের মত সাধারণ মানুষ হিসাবে গণ্যকারী। নবী রসুলদের শান এবং মান বুঝার মত যোগ্যতা তাহার ছিল না। ক্ষুধার্ত লুটেরা আরব জাতিকে সঙ্গে লইয়া আবুবকর (রা.) এবং ওমর (রা.) রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য দখল করিয়া আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান-জগতে এরা এতখানি মূর্খ ও অজ্ঞ ছিল যে তাহার প্রমাণ হইল মিশর জয়ের পর ওমর (রা)-এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ধ্বংস করা। এই লাইব্রেরীতে বিশ্বের সুপ্রাচীন ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু পুস্তক সংরক্ষিত ছিল।

যাহারা আল্লাহ এবং রাসুলকে আলাদা করে তাহারা নিশ্চয় কাফের। সূরা নেসা ৪:১৫০-১৫২।

১৫০:–নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের সঙ্গে কুফরী করে এবং প্রভেদ সৃষ্টির ইচ্ছা করে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের মধ্যে এবং বলে : "আমরা কিছু (বা কোন অংশ) বিশ্বাস করি এবং কিছু অস্বীকার করি" এবং তাহারা ইচ্ছা করে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ গ্রহণ করিতে।

১৫১:–সর্বযুগেই এই শ্রেণীয় লোকেরা প্রকৃতই কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি অপমানজনক শাস্তি।

১৫২:–এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের সহিত ইমানের কাজ করে এবং তাঁহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, শীঘ্রই তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের বিনিময় দান করেন। এবং আল্লাহ হইলেন ক্ষমাশীল রহিম।

মোহাম্মদ (আ.) প্রচারিত বিধান বদলাইয়া হযরত ওমর (রা.) শতাধিক নববিধান জারি করিয়া মোহাম্মদী ইসলামকে তাহার মূল হইতে সরাইয়া আধ্যাত্মবাদ বিরোধী এক কাষ্ঠ ধর্মে পরিণত করেন। মোহাম্মদী ইসলামে নিয়মিত সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ। হযরত ওমর (রা.) নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সৈন্য দ্বারা তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ জয় করেন। ইসলামে নবীর নির্দেশ-আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে আক্রমণ করা যাইবে না এবং জেহাদের ডাকে মোজাহেদ বাহিনী গঠন করিতে হইবে। জেহাদ শেষ হইয়া গেলে বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মোজাহেদ বাহিনীর সদস্যগণ যার যার ব্যক্তিগত কাজে পুনরায় যোগ দিবে। **মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (আ.) দুনিয়ার বুক হইতে যুদ্ধ দূর করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু নব্য আরব সাম্রাজ্যবাদ ওমর (রা.) ও আবুবকরের (রা.) নেতৃত্বে মানব জাতির উপর পুনরায় চাপিয়া বসিল রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মত। হুজুর (আ.) মানুষ কেনাবেচা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওমর (রা.) এই ঘোষণা করিলেন যে আরবদিগকে দাস বানানো চলিবে না। অনারব এবং বিজিতদের দাস বানানো যাইবে। এইভাবে তিনি পুনরায় দাসপ্রথা চালু করেন।** তৃতীয় খলিফা ওসমানকে (রা.) হত্যা করার পর তাহার প্রাসাদ হইতে ৭০ জন ক্রীতদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সামাদ পর্যায়ের চরম ব্যক্তিত্ব মাওলা আলী (আ.) কে বুঝার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা এই ধরনের ব্যক্তিরা কোথায় পাইবে? মাওলা আলী (আ.) সম্পর্কে হুজুর পাক বলিয়াছেন, "আনা মদিনাতুল এলম ওয়া আলীউন বাবুহা" অর্থাৎ আমি জ্ঞানের নগর এবং আলী তার দরজা। জ্ঞানের নগরীতে প্রবেশ করিতে হইলে আলীর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। হুজুর (আ.) এঁর আরও একটি উক্তি হইল "আনা ওয়া আলীউন মিন নূরিল ওয়াহেদ" অর্থাৎ আমি এবং আলী একই নূরের দুই টুকরা।

যুগে যুগে সামাদ পর্যায়ের ব্যক্তিগণকে কোন কালেই সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারে নাই। পদে পদে সমাজে তাহাদিগকে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল সমাজপতি এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা। সামাদ পর্যায়ের ব্যক্তিগণের কর্মকাণ্ড সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। তবে তাঁহারা যে অসাধারণ ভাল মানুষ এই কথা সমাজ বুঝে তবুও তাঁহাদের মানতে রাজি থাকে না। ঘটনাচক্রে আলী (আ.) ক্ষমতায় গেলেও ২৩ বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অভ্যস্ত আরব জাতি আলী (আ.) প্রবর্তিত আল্লাহর শাসন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তালহা, যোবায়েরের মতো নেতৃস্থানীয় স্বার্থান্বেষী লোকেরা মা'বিয়ার নেতৃত্বে তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিল।

সিফ্ফিনের যুদ্ধে মাওলা আলীর বিরোধী শক্তি, সামাদ আল্লাহয় অবিশ্বাসীরা, মা'বিয়ার নেতৃত্বে ছলে-বলে কৌশলে তাঁহাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। মাওলা আলীর দল হইতে কট্টরপন্থী বাহ্যিক নামাজ রোজা দেখানো উগ্রবাদী ধার্মিকরা মাওলা আলী (আ.) কে বিপথগামী ও অধার্মিক বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহারাই ইতিহাসে খারেজি নামে অভিহিত। আলী (আ.) ও মা'বিয়ার বিরোধের সময় জনগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। শিয়ানে আলী ও শিয়ানে মা'বিয়া। শিয়া শব্দের অর্থ দল। শিয়ানে আলী (আলীর দল), শিয়ানে মা'বিয়া (মা'বিয়ার দল)। শিয়ানে মা'বিয়াই পরবর্তীকালে সুন্নাতাল জামাত নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজাদের নিয়োজিত আলেমদের অধীনে যারা সুন্নত পালন করে তারাই পরবর্তীতে সুন্নাতাল জামাত নাম ধারণ করে। শিয়ানে আলী পরবর্তীতে শিয়া নামে পরিচিত হয়। মাওলা

আলী (আ.)-এঁর শাহাদাতের পর মা'বিয়া খলিফা নামধারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রাজা মা'বিয়া তাহার পর তাহার ছেলে এজিদকে খলিফা নামধারী রাজা বানাইয়া গেল। মোহাম্মদ (আ.) এর পর হইতে এতদিন পর্যন্ত সামাদ আল্লাহ তথা অলি-আল্লাহগণ স্বাধীনভাবে তাঁহাদের 'ধর্ম-কর্ম' এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচার করিয়া যাইতে ছিলেন। তাহাদের নেতা আলী (আ.), হাসান ও হোসাইন (আ.) তিন খলিফার আমল এবং মা'বিয়ার আমল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচার করিয়া যাইতে ছিলেন এবং রাজনীতি বহির্ভূত ধর্ম প্রচারে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হন নাই। ধর্মীয় নেতৃত্ব তাঁহাদের হাতে ছিল। এজিদ রাজা হইয়া হোসাইন (আ.) এঁর ধর্মের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া ধর্মের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজ হাতে নেয়ার জন্য এজিদের প্রতি আনুগত্য গ্রহণ করিতে হোসাইন (আ.) কে নির্দেশ দিলেন।

সামাদ আল্লাহগণ তথা নবী, রসুল, এবং আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ইমামগণ নূরে মোহাম্মদীর অধিকারীগণ কখনই সাধারণ মানুষের নিকট বায়াত গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধারণ মানুষ বাহ্যিকভাবে যত ধার্মিকই হোক আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নবী, রসুল ও ইমামগণ দুনিয়ার শক্তির কাছে আনুগত্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহারা দুনিয়ার শক্তির কাছে আনুগত্য গ্রহণ করিলে আল্লাহর ধর্ম সেখানেই শেষ হইয়া যায়। আল্লাহর ধর্ম বলিতে সেখানে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। **বাহ্যিক নামাজ, রোজা দেখানো 'ধর্ম-কর্ম' যতই করুক না কেন তাহা দ্বারা সাধারণ মানুষের পক্ষে নবী, রসুল, ইমাম হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজাগণ তথা সামাদ আল্লাহগণ নূরে মোহাম্মদীর অধিকারীগণ সমস্ত সৃষ্টির কর্তা। তাঁহারা দুনিয়াবী সকল লোভ লালসার উর্ধ্বে বাস করেন।** এইজন্য দুনিয়ার পাশবিক শক্তির কাছে তাঁহারা সর্বস্ব বিলাইয়া দেন; তবু অধর্মের কাছে মাথা নত করেন না। কারবালাতে আমরা হোসাইন (আ.) কেও সেরূপ কর্ম করিতে দেখি।

হুজুর (আ.) বলিয়াছেন, "আনা মিনাল হোসাইন ওয়া হোসাইন মিননি" অর্থাৎ আমি হোসাইন হইতে এবং হোসাইন আমা হইতে।

নানা থেকে নাতি অর্থাৎ হুজুর (আ.) হইতে হোসাইন এটা বুঝা গেল কিন্তু হোসাইন (আ.) হইতে হুজুর (আ.) কীভাবে? **হোসাইন (আ.) হইলেন নবুয়তের পুত্র। নবুয়তের রক্ষাকারী এবং নবুয়তের কার্যাদি পরিচালনার অধিকারপ্রাপ্ত উত্তরসূরি। এইজন্য হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.) কে ইবনে রসুল (রসুলের ছেলে) বলা হয়।** তাঁহারা আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের (অর্থাৎ পাক পাঞ্জাতনের) সদস্য। পাক পাঞ্জাতনের সদস্যগণ হইলেন হুজুর (আ.), মাওলা আলী (আ.), মা ফাতেমা (আ.), ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হোসাইন (আ.)। নবুয়তের জ্ঞানের যোগ্যতা মাওলা এবং ইমামগণকে দেওয়া হইয়াছে। মাওলা আলী হইলেন প্রথম আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ইমাম। নবুয়ত শেষ হইয়া গেল তাই নবুয়তের কাজের এন্তেজাম (ব্যবস্থা) করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ইমামত শুরু হইল। কিন্তু মোহাম্মদী নামধারী মুসলিম সমাজ ইমামতকে প্রত্যাখান করিল। আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ১২ জন ইমাম চেষ্টা করিয়াও জনসমর্থনের অভাবে মোহাম্মদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। ১১ জন ইমামকেই নানাভাবে হত্যা করা হইল। ১২নং ইমাম মোহাম্মদ মেহেদী (আ.) এঁর গায়েব হইয়া যাওয়ার মাধ্যমে ধরার বুকে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কারবালার পর মোহাম্মদী ইসলামের হাল

এজিদের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী মারোয়ান ক্ষমতা দখল করিয়া নিজের ছেলে আব্দুল মালেককে রাজত্ব দিয়া যান। আব্দুল মালেকের ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়াদের মধ্যে কোন্দলের ফলে সকল প্রদেশ স্বাধীন হইয়া যায়। আব্দুল মালেক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহায়তায় ইরাক, মক্কা, মদিনা হস্তগত করেন। মোহাম্মাদুর রাসুল আল্লাহ (আ.) এর সময় কোরানুল করিমে জের, জবর পেশ ছিল না, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোরানুল করিমে জের, জবর, পেশ ঢুকান। তাহার ভাবখানা এমন আমরা আরবীরা কি আরবী জানি না? এইভাবে সুকৌশলে অর্থের হেরফের ঘটান হয়।* **পানচুয়েসান (জের, জবর, পেশ, (ِ, ? ٰ,) রদবদলের মাধ্যমে অর্থের যে আকাশ পাতাল পরিবর্তন ঘটে (হয়) তাহার একটি নমুনা। আনা বাসারুম মেসলেকুম ইউহা ইলাইয়া" (অর্থ আমি তোমাদের মত মানুষ (পার্থক্য শুধু) আমার কাছে ওহি হয়।)**

হুজুর (সা.)-কে সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখাইবার ইহা একটি অপচেষ্টা।

ইহা এই রকম ছিল।

"আনা বাসারুম মেসলেকুম? ইউহা ইলাইয়া।" (অর্থ আমি কি তোমাদের মত মানুষ? আমার কাছে অহি হয়।) ইহার অর্থ আমি তোমাদের মত সাধারণ মানুষ নই।*

---

* "মা কানা মোহাম্মাদীন আবা আহাদীম মীন রেজালুকুম অলাকীন রসুলাল্লাহ ওয়া খাতেমুন নাবিয়িন" মোহাম্মদ (সা.) তোমাদের মত আহাদ জগতের সাধারণ মানুষ নন বরং তিনি আল্লার রসুল ও মোহরপ্রাপ্ত নবী), হুজুর (সা.) নূরে মোহাম্মদী দানকারি সামাদ পর্যায়ের চরম ব্যক্তিত্ব, নূরে মোহাম্মদীর আধার বা ভান্ডার। আহাদ জগতের সাধারণ বস্তুবাদী মানুষ নন।

* বলা হইয়া থাকে পড়ার সুবিধার জন্য জের, জবর, পেশ দেওয়া হইয়াছে। আলরা দিতে জানেন না, তাই আমরা দিয়া দিয়াছি।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক মদিনা যুদ্ধ জয়ের পর মদিনার জনগণের উপর নির্মম নির্যাতন, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও অত্যাচার মুসলিম ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। মাওলাদের শিক্ষায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ও গুণে মদিনায় যে সকল জ্ঞানী-গুণী মহাপুরুষ তৈরি হইয়াছিল এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা হইল। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কারখানা মদিনাকে ধ্বংস করিয়া মোহাম্মদী ইসলামকে দুনিয়া হইতে বিদায় করা হইল। আর যে সকল জ্ঞানী-গুণীগণ কোন রকমে বাঁচিয়া গেলেন তাঁহারা পার্শ্ববর্তী অমুসলিম দেশ ইরান, আফগানিস্থান, ভারত, তুর্কিস্থান, কাজাকিস্থান প্রভৃতি দেশে আত্মগোপন করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অসাধারণ জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে লোক তাঁহাদের দলভূক্ত হয়। এই সকল লোক রাজকীয় ইসলামকে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান সাধনা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান (নূরে মোহাম্মদীর জ্ঞান) অর্জনের পথে অধিক মনোনিবেশ করেন।

এইভাবে জ্ঞানী লোকেরা মোহাম্মদী ইসলামকে রক্ষার জন্য চিশ্‌তীয়া, ওয়াইসিয়া, কাদরিয়া, নক্সবন্দিয়া ইত্যাদি তরিকার প্রবর্তন করেন। তরিকাপন্থী বিভিন্ন সাধক পুরুষগণ শাসকদের রোষানল হইতে মোহাম্মদী ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বেশীরভাগ সময়ই সমাজের মূলস্রোত হইতে দূরে থাকিয়া পাগল-মস্তান বেশে ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে সুফি বলা হয়। আসহাবে সুফ্‌ফা হইতে সুফি নামের উৎপত্তি। হুজুর (আ.)-এঁর সময় মদিনার মসজিদে একদল হীন, দরিদ্র, সংসার বিরাগী লোক মোহাম্মদী আর্দশ (দায়েমী সালাত ও নূরে মোহাম্মদীর জ্ঞান)* আত্মস্থ করিবার জন্য মদিনার মসজিদে বসবাস করিত এবং নবীর উসিলায় যাহা পাইত তাহা দিয়াই জীবনধারণ করিত। ইহাদিগকে আসহাবে সুফ্‌ফা বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সালমান ফারসি, বেলাল, আবুজর গিফারির মত মহান ব্যক্তিগণ ছিলেন। সুফ অর্থ কম্বল। ইহাদের একমাত্র সম্বল কম্বল থাকায় ইহাদিগকে আসহাবে সুফ্‌ফা বলা হয়।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হেজাজের (মক্কা, মদিনায়) ক্ষমতা দখল করিয়া ঠাণ্ডা মাথায় ঘর হইতে ডাকিয়া আনিয়া সোয়ালক্ষ মোহাম্মদী ইসলামে বিশ্বাসী লোককে হত্যা করিয়াছিলেন। **উমাইয়া রাজা (খলিফা) আব্দুল মালেক ক্ষমতা সুসংহত করিয়া তাহার আজ্ঞাবহ**

---

* টিকা : ২৪ ঘণ্টা সালাতকে দায়েমী সালাত বলে।

ধর্মীয় পণ্ডিত বানাইবার জন্য জেরুজালেমে ইসলামী দুনিয়ার সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে খলিফা মালেক খারেজিদের বাঁছিয়া লন। আধ্যাত্মবাদ বিরোধী, কট্টর অনুষ্ঠানবাদী, মোহাম্মদী ইসলাম হইতে খারেজ (বাহির হইয়া যাওয়া) খারেজিরা মোহাম্মদী ইসলামের ধর্মীয় নেতা হইয়া বসিল। সেখান হইতে খলিফা আব্দুল মালেক তাহার আজ্ঞাবহ বস্তুবাদী আলেম তৈরি করিয়া দেশের সর্বত্র মসজিদ গুলিতে নিয়োগ দান করেন। এই সকল বস্তুবাদী আলেমরা সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সরকারি নির্দেশ মতো তাহারা ঐ এলাকার সকল খবরা-খবর রাজাকে অবহিত করিত।

হুজুর (আ.) বলিয়াছেন, "আমি ও আলী একই নূরের দুই টুকরা" (অর্থাৎ আনা ওয়া আলীউন মিন নূরিল ওয়াহেদ)। "আলী যে দিকে মোড় নেয় আল্লাহর ধর্ম সেদিকে মোর নেয়।" হুজুর (আ.) আরও বলিয়াছেন, "আমি আল্লাহর নূর হইতে, আমার নূর হইতে সমস্ত সৃষ্টি" (অর্থাৎ আনা মিন নূর আল্লা কুল্লে সাই ইন মিন নূরি)। **সমস্ত সৃষ্টি মোহাম্মদী নূরের বিকাশ। মোহাম্মদী নূর হইতেই সমস্ত সৃষ্টি আগত। যেখানে মোহাম্মদ (আ.) এবং আলী (আ.) সেই একই নূরের দুই টুকরা, সেই আলী (আ.) কে খারেজিরা বিপথগামী এবং ইসলাম বিরোধী জানিয়া বিরুদ্ধাচারণ করিত। তাহাদেরকেই মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিয়োগ করিয়া মোহাম্মদী ইসলামকে বিচক্ষণতার সহিত ধ্বংস করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল।**

আব্দুল মালেকের আমল হইতেই জুমার নামাজের খুৎবায় আলী (আ.)-এঁর বংশের উপর লানত (অভিশাপ) পাঠ করা হইত। ৩০ (ত্রিশ) বৎসর পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। উমাইয়া রাজা (খলিফা) ওমর বিন আব্দুল আজিজ এই অভিশাপ পাঠ বন্ধ করেন।

হযরত আবুবকর (রা.) যে আধ্যাত্মবাদ বর্জিত রাজকীয় ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন, হযরত ওমরের শতাধিক নববিধান তাহাকে উজ্জীবিত করে। পরবর্তীকালে উমাইয়া রাজাগণ উহাকে বৃক্ষে রূপ দেয় এবং আব্বাসীয় যুগে উহা ডাল-পালা বিস্তার করিয়া মহিরুহ বৃক্ষে পরিণত হয়। ৯০ বৎসর উমাইয়া রাজত্ব ছিল। আব্বাসীয়রা মোহাম্মদ (আ.) এঁর বংশধরকে ক্ষমতায় বসাইবার হুজুগ উঠাইয়া বিপ্লব ঘটাইয়া রাজকীয় ক্ষমতা দখল করে।

আব্বাসীয় রাজাদের অধার্মিক কার্যকলাপে অতিষ্ট হইয়া আলী বংশীয় আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ষষ্ঠ ইমাম-ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এঁর সৎভাই মোহাম্মদ ও ইব্রাহীম ইরাকে ও পারস্যে বিদ্রোহ করেন। রাজা (খলিফা) আল মনছুর অতিকষ্টে বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন। এই সময় রাজা কর্তৃক মনোনীত ফেকাহবিদ ইমাম আবু হানিফা বিভিন্নভাবে রাজাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অপরাধ তিনি গোপনে বিদ্রোহে অর্থ দিয়া রাসুলের বংশধরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আব্বাসীয় যুগে আধ্যাত্মবাদ বর্জিত রাজকীয় ধর্ম (আনুষ্ঠানিক ধর্ম) এত বিশদভাবে বিশ্লেষিত ও বিস্তৃত করা হয় যাহাতে মানুষের মনে কোন সন্দেহ উদিত না হয়। "এত কথা কি সবই মিথ্যা হইতে পারে?" এরকম ভাব যেন মানুষের মনে আসে। আব্বাসীয় রাজারা বড় বড় পণ্ডিতকে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তফসির জগতে বিরাট গোলযোগের পাহাড় তৈরি করিয়া গিয়াছেন। বেতন ভোগী আলেম দ্বারা বহু মিথ্যা হাদিস রচনা করিয়া কোরানের অপব্যাখ্যাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

রাজা কর্তৃক মনোনীত ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের দ্বারা রাজকীয় ইসলামকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা–হানাফি, মালেকি, সাফি ও হাম্বলী এবং সবগুলিকেই সহি বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। শিয়াদেরকেও বহু ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। হায়দারী শিয়া, এসনে আশারি শিয়া, বোররা শিয়া, ইসমাইলিয়া শিয়া ইত্যাদি। এইসব ভাগের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া দলাদলিতে নিয়োজিত রাখিয়া অনৈক্য সৃষ্টি করা। এই বিভেদের সুযোগে নিজেদের রাজত্ব সুসংহত করা।

১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ ও শেষ আব্বাসীয় রাজার (খলিফার) মৃত্যু এবং বাগদাদ নগরী ধ্বংসের মাধ্যমে মোঙ্গলরা পারস্যে তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৪শত খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খানের প্রপৌত্র গাজান খান চারশত মোঙ্গল প্রধানকে লইয়া শিয়া ইসলামে দীক্ষিত হন। ইহার প্রভাবে পারস্যে শিয়া ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

শিয়ারা মোহাম্মদ (আ.) এবং তাঁহার আলে-মোহাম্মদের প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও শত শত বৎসর রাজকীয় প্রভাবের ফলে তাহাদের ভিতর আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিলোপ ঘটে। তাহারা

আত্মিক জ্ঞানশূন্য অনুষ্ঠান সর্বস্ব জাতিতে পরিণত হয়। মানুষ যে নূরে-মোহাম্মদীর জ্ঞানে-জ্ঞানী হইয়া অলি-আল্লাহ তথা সামাদ আল্লাহ হইতে পারে ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। তাই তাহাদের মধ্যে অলি-আল্লাহ বা মহাপুরুষ দেখা যায় না।

ভারতে মোহাম্মদী ইসলাম মহাপুরুষগণের দ্বারা প্রচারিত। মোহাম্মদী নূর প্রাপ্ত হইয়া মহাপুরুষরা এ দেশে মোহাম্মদী ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাই দলে দলে লোক মোহাম্মদী ইসলাম গ্রহণ করিয়া নূরে মোহাম্মদীর জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া অলি আল্লাহ হইয়াছিলেন। এদেশে মোহাম্মদী ধর্ম প্রচারে খাজাবাবার অবদান অনস্বীকার্য। ১১৯১-৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আজমীরে অবস্থান লইয়া প্রায় ৯২ লক্ষ লোককে মোহাম্মদী ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি একজন সুফি সাধক ছিলেন। তিনি তাহার শিষ্যগণকে সামা দরবেশি নৃত্য ও আধ্যাত্মিক গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা দায়েমী সালাত (২৪ ঘন্টার সালাতকে দায়েমী সালাত বলে) শিক্ষা দিতেন।* আসসালাতু দায়েমুন (সালাত দায়েমী)। তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের সর্বত্র জনগণকে ধ্যান-সাধনা শিক্ষা দিয়া মোহাম্মদী আদর্শে গড়িয়া তুলেন।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরির দিল্লী জয়ের মাধ্যমে এদেশে রাজকীয় ইসলামের (আনুষ্ঠানিক দেখানো ধর্মের) অনুপ্রবেশ ঘটে। এদেশ হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় রাজারা সাধারণত অলি-আল্লাহদের উপর বড় একটা হস্তক্ষেপ করিত না। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করিয়া ছিলেন। তিনি সুফি সাধক সেলিম চিশ্‌তী'র (র) শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তিতে **সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে হিন্দু বিদ্বেষী নীতির ফলে মারাঠা শক্তি জাগিয়া উঠে এবং মোঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব আধ্যাত্মবাদ বিরোধী বস্তুবাদী অনুষ্ঠান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে ২জন অলি-আল্লাহকে বেনামাজী আখ্যায়িত করিয়া হত্যা করেন।** তাঁহাদের মধ্যে একজন অলির নাম 'শেরে মাস্ত'। তাঁহার মাজার দিল্লীর জুমা মসজিদে অবস্থিত। **আওরঙ্গজেব যে বই লিখিয়া গিয়াছেন তাহা 'ফতুয়ায়ে আলমগীর' নামে পরিচিত। ইহা একটি আধ্যাত্মবাদ বিরোধী ওহাবী আকিদার বই। আমাদের দেশের বর্তমান প্রায় সব আলেম ওলামা 'ফতুয়ায়ে আলমগীর' এর ভক্ত।** মারাঠা

---

* আনুষ্ঠানিক সালাত বা নামাজ ধর্মের প্রাথমিক (অ,আ) অবস্থা।

শক্তির সাথে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। উভয় শক্তির কোন্দল ও দুর্বলতার সুযোগে ভারতে পরবর্তীতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান জার্মানীর পক্ষে যোগদেন। কারণ তার মধ্য-এশীয় দেশসমূহ (কাজাকিস্থান, তুর্কিস্থান, তাসখন্দ, সমরখন্দ ইত্যাদি অঞ্চল) রাশিয়া দখল করিয়া লয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্ররোচনায় এবং সাহায্যে তুরস্কের হাত ছাড়া হইয়া যায়। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বিরোধীতার কারণে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করিয়া তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের প্রদেশ সিরিয়া, মিশর, ইরাক, জর্দান এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চলসমূহে বৃটিশের সহায়তায় প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীন রাজা হইয়া বসে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে **আরবের হেজাজ প্রদেশের নজদে 'আব্দুল ওহাব নজদি' নামে এক ব্যক্তি ওহাবী মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন–নবী, রসুলগণ আমাদের মত সাধারণ মানুষ। তাহারা পাপ পূণ্যের অধীন। তাহাদেরও পাপ পূণ্যের হিসাব দিতে হইবে। আধ্যাত্মবাদ, অলি-আল্লাহ, মহাপুরুষ বলিতে কিছু নাই। যে যত বাহ্যিক নামাজ-রোজা করিবে সে তত পূণ্যের অধিকারী হইবে। নামাজ রোজা করিয়া নবী রসুলদেরও উর্ধ্বে উঠা যায়।** 'আব্দুল ওহাব নজদি' নজদে তাহার মতবাদ প্রচারে কৃতকার্য হন। নজদের সরদার 'ইবনে সৌদ'ও তাহার মতবাদে দীক্ষিত ছিলেন।

ইবনে সৌদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশের সহায়তায় তুর্কি শাসককে পরাজিত করিয়া মক্কা, মদিনা (হেজাজ) দখল করেন। মক্কা, মদিনার জনগণ এবং আলেম ওলামাগণ সুন্নি আকিদায় বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেন। ইবনে সৌদ মক্কা, মদিনায় (হেজাজে) কয়েকদিন হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া আলেম ওলামা ও জনগণকে বিধ্বস্ত করেন। এরপর তিনি নিজেকে হেজাজের রাজা ঘোষণা করেন। তিনি হেজাজের নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নাম অনুসারে 'সৌদি আরব' রাখেন।

১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করিয়া রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতে সরাসরি নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় জনগণের ধর্ম ও কৃষ্টির নিরাপত্তা

দিয়া তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগীতার আশ্বাস দেন। **সেই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা মুসলমানদের জন্য দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।** দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম প্রিন্সিপাল একজন বৃটিশ খৃষ্টান ছিলেন। **ভারতের বেশিরভাগ মুসলমান সেই সময় আধ্যাত্মবাদ ও অলি-আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিল। মুসলমানগণ যাহাতে নিজেদের মধ্যে ধর্ম নিয়া ঝগড়া ও কোন্দলে লিপ্ত হয় এইজন্য এই দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে ওহাবীদের নিয়োগ দেয়া হয়।**

এই মাদরাসার শিক্ষা পাঠ্যক্রম ওহাবী আকিদায় শুরু করা হয় যাহা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নতুন আমদানীকৃত। ইহার ফলে পরবর্তিতে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন্দলে লিপ্ত হয় এবং বৃটিশ বিরোধী মনোভাব হইতে দূরে থাকে।

বৃটিশ ভারতে ওহাবী আন্দোলনও ছিল মোহাম্মদী ইসলাম তথা আধ্যাত্মবাদী ধর্মীয় আদর্শের উপর বস্তুবাদী রাজকীয় ইসলামের (দেখানো আনুষ্ঠানিক ধর্মের) তথা অনুষ্ঠানবাদীদের বিজয়। অনুষ্ঠানবাদীরা আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মবাদকে সমাজ হইতে ঝাঁটিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।

দেওবন্দ মাদরাসার বদৌলতে আজ দেশের সকল মাদরাসায় ওহাবী মতবাদ জাকাইয়া বসিয়াছে। আজ শিয়া কি সুন্নি উভয়ই বস্তুবাদী তথা অনুষ্ঠানবাদী ধর্মে বিশ্বাসী। পৃথিবীতে যত ইসলামী মাদরাসা আছে উহা খারেজি, ওহাবী এবং দেওবন্দি নেসাব (পদ্ধতি) দ্বারা চালিত। শিয়াদের মাদরাসা শিয়া নেসাব দ্বারা চালিত। তাই এইসব মাদরাসা দ্বারা মোহাম্মদী ইসলামের উপকার না হইয়া বরং অপকার সাধিত হইতেছে। মানুষ অলি-আল্লাহ হওয়ার ট্রেনিং না পাইয়া বস্তুবাদী রাজকীয় ইসলামে তথা অনুষ্ঠানবাদী দেখানো ধর্মে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের খুব কম সংখ্যক লোকই নিজের মধ্যে মোহাম্মদী নূর জাগ্রত করিয়া মহিয়ান তথা অলি-আল্লাহ হইবার বাসনা পোষণ করে। আমরা সবাই গড্ডালিকা প্রবাহের মতো বস্তুবাদী আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া এবং আধ্যাত্মবাদ অস্বীকার করিয়া আমাদের ধর্মীয় কর্ম সম্পাদন করিতেছি। আমাদের মধ্যে আল্লাহর জাগরণে যত্নবান হইতেছি না। নূরে-মোহাম্মদীর পূজার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদিগকে আমাদের মধ্যে নূরে মোহাম্মদীর জাগরণে তৌফিক দান করুন।

ধর্মদর্শন

সকল ধর্মের দর্শনই মূলত এক। ধর্ম দর্শনের মূল কথা–হে মানুষ, আমি (সৃষ্টিকর্তা) তোমার মাঝে আছি। আমাকে চেন এবং জানিবার চেষ্টা কর। সৃষ্টির মাঝে আমি রবরূপে বিরাজিত। কোরানে বলিয়াছে, "লা মাওজুদা ইল্লাল্লা" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছু নাই। আমরা সৃষ্টিরূপে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা আল্লাহরই বিকাশ। আল্লাহ রূপে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। হিন্দু, বুদ্ধ, খ্রিষ্টান, মোহাম্মদী ইসলাম যত ধর্ম আছে সকল ধর্মেই নিজেকে চেনার কথা বলিতেছেন। নিজেকে চেনা ও জানার নামই আল্লাহর ধর্ম। **সনাতন ধর্মে (হিন্দু ধর্মে) জীবনকে চারভাগে ভাগকরা হইয়াছে।**

১. বাল্যে গুরুগৃহে জ্ঞান অর্জন,

২. যৌবনে গৃহস্থালি পালন,

৩. প্রৌঢ়ে সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ধ্যান-সাধনা প্রয়োজনে ছেলে মেয়েরা গিয়া উপদেশ ও পরামর্শ নিবে, এবং

৪. বার্ধক্যে সবার থেকে দূরে গিয়া পূর্ণ সন্ন্যাস। এইভাবেই জীবনকে সাজানো হইয়াছে। যাহাতে মানুষের মাঝে স্বয়ং এঁর বিকাশ; তাহা জানিয়া ও বুঝিয়া তাঁহারই মাঝে মানুষ যেন লীন হইতে পারে। ধর্ম-দর্শন বুঝা জ্ঞানী লোকের কাজ। তাই সাধারণ মানুষের জন্য ইহা বুঝা খুবই কঠিন বিধায় সাধারণ মানুষও যেন ধর্ম পালন করিয়া ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানের স্বাদ পাইতে পারে তাহার সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ধর্ম-দর্শনের ভিতরে দান করা হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে দুর্গাপূজা করিয়া সাধারণ মানুষ দুনিয়ার শান্তি ও কল্যাণের জন্য দোয়া চাহিতেছে এবং নিজের

জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাইবার কামনা করিতেছে। **অপর দিকে জ্ঞানী লোকেরা পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেকে দুর্গারূপে তৈরি করার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর উপর যিনি রাজা হইয়া গিয়াছেন তিনিই দূর্গা।** সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে নারীর চেহারাকে দেখান হইয়াছে। আমরা মানব জাতি নারীকে সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে কল্পনা করি। দূর্গারূপী ব্যক্তিরাই সমাজে অসুররূপী মানুষকে পরিবর্তন (বধ) করিয়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। অসুররূপী মানুষেরাই সমাজে অশান্তি এবং অধর্মের প্রতিষ্ঠাকারী।

হুজুর (আ.) এঁর মেরাজেও আমরা দেখিতে পাই তিনি বোরাকে চড়িয়া আল্লাহকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 'বোরাক' নামক বাহনের চেহারাও নারীর চেহারারূপে দেখানো হইয়াছে। মানুষের মাঝে যখনই নূরে-মোহাম্মদীর বিকাশ হয় তখন তাহা আল্লাহর নূরে-নূরান্বিত হইয়া মহাসুন্দররূপ ধারণ করে। মহাসুন্দরকে বুঝাইবার জন্য সুন্দর নারীর চেহারাকে দেখানো হইয়াছে। ঘোড়াকে তখনকার দিনের দ্রুত বাহনরূপে দেখানো হইয়াছে। 'বারকুন' অর্থ বিদ্যুৎ। ঘোড়ার দ্রুতগতি বিদ্যুৎ সম দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ একজন মানুষকে তার পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর (বা সপ্তইন্দ্রিয়ের) উপর জয়ী হইতে হইলে দৃঢ় প্রত্যয়ী বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন হইতে হইবে। তবেই সে আল্লাহ প্রাপ্তির তথা আল্লাহর দর্শনের উপযুক্ত হইবে। আল্লাহপ্রাপ্ত হইলেই সে হুর রূপী সুন্দর (নারী) সৌন্দর্যের প্রতীক হইয়া যায়।

حور হে, ওয়া, রে 'হুরকে' বিপরীত দিক হইতে পাঠ করিলে روح (রুহু) হয়। রুহু আল্লাহর জাত নূর। **যে ব্যক্তি রুহু অর্জন করিয়াছেন তিনি তাহার নিজ চেহারায় আল্লাহর চেহারা দর্শন করেন তথা নিজে আল্লাহর চেহারা লাভ করিয়া (হুর) বা অলি-আল্লাহ হইয়া যান (তথা আল্লাহ হইয়া যান)**। "ল মাওজুদা ইল্লাল্লা" (আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই)। 'বারকুন' অর্থ বিদ্যুৎ। বারকুন হইতে বোরাক নাম আসিয়াছে। বোরাকের গতি বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন অর্থাৎ তিনি বিদ্যুৎ গতিতে গমন করিয়া আল্লাহর দর্শন করিয়াছেন। আবার বলা হইয়া থাকে মোহাম্মদ (আ.) ঘরের দরজার জিনজির নড়া শেষ হয় নাই;

এই সামান্য সময়ের মধ্যে তাঁহার মোহাম্মদ (আ.) এঁর মেরাজ হইয়াছিল। আবার বলা হইয়া থাকে ওযুর পানি মাটিতে শুকাইবার আগেই তাহার মেরাজ গমন সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সকল কথা বলার মাধ্যমে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি নিজের ভিতরে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মুহূর্তেই আল্লাহর সব সৃষ্টি এবং আল্লাহকে দর্শন করিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজিত "লা মওজুদা ইল্লাল্লা" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই। আল্লাহকে দর্শনের জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। মুহূর্তেই তিনি সব সৃষ্টি দর্শন করিয়াছিলেন নিজের ভিতরে আত্মদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের প্রাণশিরারও অতি নিকটে আছেন। সেই আল্লাহকে দর্শনের জন্য সপ্ত আকাশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষের মাঝেই আল্লাহ নূরে-মোহাম্মদীরূপে বিরাজিত।

হুজুর (আ.) বলিয়াছেন, "আনা মিন নূর আল্লা কুল্লে সাইইন মিন নূরি" (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর হইতে আমা হইতেই সমস্ত সৃষ্টি)। মোহাম্মদী নূর হইতেই তথা মোহাম্মদ হইতেই সমস্ত সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহর এক আজব সৃষ্টি। মানুষের মাঝেই আল্লাহ নিজেকে পূর্ণরূপে বিকাশ হইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। সেই মানুষের মাঝে ইবলিস তথা আমিত্ব সৃষ্টি করিয়া তথা আমিত্ব দিয়া আল্লাহ পরীক্ষা করিতেছেন কে তাঁহাকে তথা আল্লাহকে তাহার নিজের মাঝে দেখিবার চেষ্টা করে না দুনিয়াবী লোভ-লালসায় মত্ত হইয়া অসুররূপী দানব মানুষে পরিণত হয়। মানুষের মাঝে আল্লাহ বিরাজিত তাহা জানাইবার এবং বুঝাইবার জন্যই যুগে যুগে মহা মানবদের অর্থাৎ নবী, রসুল, অলি-আল্লাহদের পাঠানো হইতেছে। "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" (যে নিজেকে দর্শন করে নিশ্চয়ই সে তার রবকে দর্শন করে)। নিজেকে দর্শন করার নামই প্রকৃত ধর্ম। গড দি ফাদার, গড দি সান, গড দি হলিগোষ্ট করিয়াই করেন অথবা হরে কৃষ্ণ করিয়াই করেন অথবা হাজার রাকাত নামাজ পড়িয়াই করেন যে ভাবেই করেন নিজের মাঝে (প্রতিটি মানুষের মাঝে) আল্লাহ বিরাজিত তাহাকে চিনিয়া এবং জানিয়া নিজেকে মরিতে হইবে তবেই নিজের জীবন স্বার্থক হইবে। নতুবা আল্লাহ যে প্রেম খেলা খেলিবার জন্য মানব সৃষ্টি করিয়াছেন

তাহা পূর্ণ করিতে আমরা মানুষেরা ব্যর্থ হইব। কেহ বলেন পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চরিপু কেহ বলেন সপ্তইন্দ্রিয় যে যাই বলুন তাহার উদ্দেশ্য এই ইন্দ্রিয় ও রিপুর উপর নিজেকে জয়ী হইয়া নিজের মাঝে স্রষ্টাকে দর্শন করা। নিজের মাঝে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না থাকা কালীন আপনি আল্লাহকে তথা নিজেকে চিনিতে পারিবেন না। নিজেকে চেনা ও জানার জন্য এই রিপুগুলির উপর জয়ী হইয়া তথা রাজা বনিয়া যাইতে হইবে। তবেই আল্লাহ তথা ভগবান আপনার মাঝে জাগ্রত হইবেন। এইভাবে নিজেকে দেবতা ও দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা না পর্যন্ত আপনার মাঝে ভগবান তথা আল্লাহর জাগরণ সম্ভব নয়। আল্লাহর জাগরণ ঘটাইয়া অলি-আল্লাহ হওয়ার ইহাই পদ্ধতি।

'অলি' অর্থ বন্ধু, আল্লাহর বন্ধু হইতে হইলে আপনার মাঝে আল্লাহর শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আপনাকেও আল্লাহ শক্তিসম্পন্ন হইয়া যাইতে হইবে। তবেই আপনি অলি-আল্লাহ হইতে পারিবেন। পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চরিপু তথা সপ্তইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনি যতক্ষণ আবর্তন করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মাঝে আল্লাহ জাগ্রত হইবে না এবং আপনিও অলি-আল্লাহ তথা মানবরূপী আল্লাহ (আদম) হইতে পারিবেন না। আদম রূপী মহামানব হইলেই সে সেজদার যোগ্য হইয়া যায়। এবং সারা সৃষ্টি তাহাকে সেজদা করে।

আমরা জানি মসজিদঘর আল্লার ঘর. এটা কোন ঘর? মোমিনের অন্তর।

"কুলুবুল মোমেনীনা আর্শ আল্লা" (মোমিনের অন্তর আল্লার আর্শ বা ঘর) যেখানে আল্লাহ্ অধিষ্ঠিত হন। কোরানে আছে **মুসা (আ.)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন মিসরে তোমাদের ঘরগুলিকে প্রতিটি ঘরকে মসজিদে পরিণত (রূপান্তরিত) কর। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে বসবাসকারী অমানু ইমানের মহড়াকারী ব্যক্তিকে মোমিনে রূপান্তরিত কর।** আর যদি ইটপাটকেলের ঘরকে আল্লার ঘর বলা হয় তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে ইহা তৈরিতে কাফের বেদ্বীন সবাই জড়িত। ইট তৈরিতে সিমেন্ট তৈরিতে, রড তৈরিতে এমনকি এই সকল বস্তু তৈরি করার জন্য যে সকল মেশিন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা তৈরিতে আল্লাতে অবিশ্বাসী কাফের বেদ্বীন সবাই জড়িত।

কাফের, বেদ্বীন, গুন্ডা, বদমাসের টাকা, অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ, ঘুষের টাকা সবই ইটপাটকেলের মসজিদে ব্যবহৃত হয়, কেহ গায়ে খাটিয়া, কেহ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া বিভিন্নভাবে কাফের বেদ্বীনেরাও ইটপাটকেলের মসজিদ তৈরিতে সাহায্য সহযোগিতা করিয়া (আসিতেছে) থাকে। কাজেই আল্লাহ সবার জন্য বেহেস্তে ঘর বানাইতে বাধ্য, হাদিসে আছে "মান বানা মাসাজেদাল লা বানাল লাহা মাকানা ফি জান্না" (যে বানায় আল্লাহর মসজিদ আল্লা তাহার জন্য বেহেস্তে ঘর বানায়) এখানে কোন শর্ত নাই, যে বানায়, যে কেহই হোক।

ইটপাটকেলের মসজিদ কখনই আল্লার ঘর হইতে পারে না। ইহা এবাদত খানা ঘর, রোদ, বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য, মোমিনের অন্তর আল্লাহ মসজিদ, মোমিন নূরে মোহাম্মদী প্রাপ্ত হইয়া আদম রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাই আল্লা তাহার মাঝে অধিষ্ঠিত (জাগ্রত) এবং সমস্ত সৃষ্টি তাহাকে তথা আল্লাকে (আদমরূপে) সেজদা করে। "কুলুবুল মোমেনীনা আর্শ আল্লা" (মোমিনের অন্তর আল্লার আর্শ)।

আমরা দূর্গা পূজা করি দূর্গা হওয়ার জন্য। দূর্গা পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর উপর জয়ী হইয়া তথা রাজা হইয়া দূর্গারূপ ধারণ করিয়াছেন। দূর্গার প্রতিটি হাতই পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর উপর রাজা হওয়ার প্রতীক। দূর্গা স্নেহশীল মায়ের মত আমাদের দূর্গাসম ব্যক্তিরা আগলাইয়া রাখিয়াছেন। নারী মূর্তি আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতীক। পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পঞ্চরিপুর উপর জয়ী হইয়া দূর্গা মা আমাদিগকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। যেহেতু আমরা দুনিয়াবী মানুষ তাই আমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ লইয়াই তাহার স্মরণাপন্ন হই। খুব কম লোকই তাহার মাঝে আল্লাহ পাওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর রূপ নিজের মাঝে জাগ্রত করিয়া দূর্গারূপ ধারণ করে তথা অলি-আল্লাহ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম-কর্ম করার জন্য উপদেশ দিতেছেন। নিষ্কাম-কর্মের মাধ্যমে মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় ও পঞ্চরিপুর তথা সপ্তইন্দ্রিয়ের উপর জয়ী হইয়া ধর্মের কালের রাজা হইয়া সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

যুগে যুগে যত নবী রসুল মহাপুরুষ আসিয়াছেন সকলেই এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। হে মানুষ, সকল লোভ লালসার ঊর্ধ্বে থাকিয়া

ধর্মের কালের রাজা হও। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে তুমি কে? কেন তোমাকে পাঠানো হইয়াছে। তোমার মাঝেই ভগবান লীলায়িত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তোমাতেই স্বয়ং বিরাজিত। ইহা দর্শনে যোগ্যতা অর্জন করিয়া তুমি যে মহানূর (নূরে-মোহাম্মদী) হইতে আসিয়াছ সেই মহানূরে লীন হইতে পারিবে। তথা দেবতা বা মহামানব হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে। এই ধরাধামে তোমাকে দেবতা হওয়ার জন্য পাঠান হইয়াছে। অসুর হইয়া থাকার জন্য নয়। অসুর ভাব ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে দেবতা হও।

ভগবান মোহাম্মদ বলিতেছেন, "আনা মিন নূর আল্লা কুল্লে সাইইন মিন নূরি," (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর হইতে আমা হইতে সমস্ত সৃষ্টি)। আল্লাহ মহানূররূপে সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই কারণে **ভগবান বুদ্ধ আল্লাহ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকিয়া নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়ার উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজের ভিতর দেখিয়া লও কোথায় ভগবান বিরাজিত।** "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" (যে নিজেকে চিনিয়াছে নিশ্চয়ই সে তাহার রবকে চিনিয়াছে)। এই কারণে বুদ্ধরা ধ্যান সাধনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। **ধ্যানের মাধ্যমে অসুর মানব, মহামানব তথা ভগবানেররূপ দর্শন করিয়া নিজের রূপের মাঝে ভগবানকে দেখিতে পায়। ভগবানই যে, রূপে-রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন তাহা বুঝিয়া নিজে ভগবানে পরিণত হয়। এই কারণে মনসুর হাল্লাজ বলিয়াছেন, "আয়নাল হক" (আমিই স্বয়ং)** ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইতে পারিলে মহাসত্য তাহার মাঝে মূর্ত হইয়া ওঠে। তখন নিজের মাঝেই মহাপ্রভুকে দেখিতে পায়।

মা মরিয়ম যাকারিয়া (আ.) তত্ত্বাবধানে (ধ্যানে) একাকি একটি ঘরে অবস্থান লইয়া রবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রবের অলৌকিক লীলায় ঈসা (আ.) এর জন্মদান করিয়া জগতকে ধন্য করিয়াছিলেন।

মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে ৪০ দিন ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া আল্লাহর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় ধ্যান সাধনা ব্যতীত কোন জ্ঞান অর্জনই সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানী আইনিস্টাইন এবং অন্যান্য বড় বিজ্ঞানীরা দুনিয়াবী কোন কিছুর জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং কোন কিছু আবিষ্কারের জন্য নিজেকে ঐ বিষয়ের উপর নিমগ্ন রাখিয়া তবেই ঐ বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। কাজেই দেখা যায় দুনিয়াবী অথবা আধ্যাত্মিক যে জ্ঞানই আপনি অর্জন করিতে চান আপনাকে ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হইবে। আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য ধ্যান-সাধনা অবধারিত। ধ্যান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহ প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

হুজুর (আ.) ও দেখাইয়া গিয়াছেন তিনি ২৫ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন–হে মানবমণ্ডলী, যদি আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করিতে চাও বা পাইতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে নিরিবিলিতে ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হইবে। যদিও তিনি স্বয়ং নূরের তৈরি তাঁহার জন্য ধ্যানের কোন প্রয়োজন নাই।

হুজুর (আ.) বলিয়াছেন, "আনা মিন নূর আল্লা কুল্লে সাইইন মিন নূরি" (আমি আল্লাহর নূর হইতে আমা হইতে সমস্ত সৃষ্টি)। তাঁহার অনুসারীদের শিক্ষার জন্য ইহা সুন্নতে রসুল হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহার অনুসারীরা ইহার ধার ধারে না। ধ্যানকে বাদ দিয়া এবং স্বীকৃতি না দিয়া তাহারা মোহাম্মদী ইসলামকে একটা কাষ্ঠ ধর্ম বানাইয়া লইয়াছে। ইহার ফলে তথা কথিত ইসলাম ধর্মীয় পণ্ডিতের মাঝে সত্যিকার জ্ঞানের কিছুই দেখা যায় না।

পৃথিবীতে ধ্যানী সাধক অলি-আল্লাহগণের দ্বারাই মোহাম্মদী ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। কাঠমোল্লা-মৌলবীদের দ্বারা নয়। আমাদের এই দেশেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। ১০০০ (এক হাজার) বছর আগে এই বাংলাদেশে একজনও মোহাম্মদী মুসলমান ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষ অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ধ্যানী সাধক অলি-আল্লাহগণের দ্বারাই মোহাম্মদী ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এদেশেও সেই সময় অনেক বিচক্ষণ ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদী ধ্যানী পণ্ডিতগণ আল্লাহপ্রাপ্ত হইয়া এতই মহাজ্ঞানে-জ্ঞানী ছিলেন যে এদেশের পণ্ডিতগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া আল্লাহর রঙ্গে নিজেকে রাঙ্গাইয়া আল্লাওয়ালা মহান অলি-আল্লাহ হইয়া

গিয়াছিলেন। ধ্যানই মানবজাতির জ্ঞানের উৎস। ধ্যান ব্যতীত কোন কিছু অর্জন সম্ভব নয়। নিজের ভিতর ধ্যানের মাধ্যমে মহান রবকে দর্শন করিতে হয়।

গল্পগুজব ধর্ম নয়। কোন কোন নাম পণ্ডিতদের দেখা যায় গল্পগুজবের মাধ্যমে ধর্ম বুঝাইতে যাইয়া জনগণের কাছে গল্পকেই আল্লাহর ধর্ম বানাইয়া দেয়। জনগণ গল্পগুজব শুনিতে ভালবাসে, সব জাতির মাঝেই ধর্মীয় গল্পগুজব প্রচলিত আছে। ইহা শুনিয়াই তাহারা আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং গল্পগুজব শোনাকেই ধর্ম জানিয়া আল্লাহর ধর্ম পালন করিতেছে এবং কল্যাণ লাভ করিতেছে বলিয়া মনে করে। ধ্যান সাধনার মত কঠিন পথে চলা হইতে বিরত থাকিয়া নিজেকে চেনা হইতে বিরত থাকে। পরিণামে তাহাদের আল্লাহ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্মীয় জ্ঞানে অন্ধ, অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়াই জীবন কাটাইয়া যায়।

যুগ যুগ হইতে প্রচলিত (সকল জাতির মধ্যে) কাশাসুল আম্বিয়া (নবী কাহিনী) পুস্তক পাঠ করিয়া তথা কথিত নাম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ গল্পগুজব প্রচার করিয়া সাধারণ জনগণকে গল্পগুজবের ধর্ম শিখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মের নিগুঢ় রহস্য বুঝার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা এই সকল তথা কথিত পণ্ডিতের নাই। কোরানে কোথাও পূর্ণাঙ্গ গল্প (নবী কাহিনী) নাই। এইসব কল্পকাহিনী ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কোরানের তফসির বলিতে যাইয়া তথা কথিত পণ্ডিতরা এই সকল কল্পকাহিনী বলিয়া থাকে। মহাপুরুষগণ যে সকল বিধান দান করেন সাধারণ মানুষ ইহা পালন করিয়া মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। এই সকল বিধান লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গেলে উপলক্ষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তবে মহাপুরুষদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেই সকল বিধান এইজন্য পালন করিতে দেখা যায়। যাহাতে শিষ্যগণ উহা পালন করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হইয়া গেলে বিধানের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। বিধান যুগে যুগে পরিবর্তন করিয়া মহাপুরুষগণ উহা যুগোপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

হুজুর (আ.) বলিয়াছেন, "সিরুফিল আর্দ" (অর্থাৎ দেহের ভিতরে ভ্রমণ কর)। 'আর্দ' অর্থ মাটি বা দেহ। এই দেহের ভিতর ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে। এই কারণে দেহের ভিতর ভ্রমণের তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। শিয়া, সুন্নি উভয়ই অনুষ্ঠান সর্বস্ব কাষ্ঠ ধর্মের অনুসারী। তথাপি শিয়াদের ফজরের নামাজের আযানে আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম না বলিয়া, আস্‌সালাতু খাইরুল আমল (অর্থাৎ আল্লাহর সহিত যোগাযোগ উত্তম আমল) বলিতে শোনা যায়।

হযরত ওমরের (রা.) শতাধিক নব বিধানের মধ্যে ইহাও একটি (আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম) (নামাজ বা সালাত ঘুম হইতে উত্তম)। তিনিই ইহা ফজরের আযানের সহিত জুরিয়া দেন। ঘুমে মানুষ অর্ধ মৃত অবস্থায় থাকে, পাপ পূণ্য হইতে ঊর্ধ্বে বাস করে। এমনকি একজন খুনিও ঘুমের মধ্যে কোন পাপ করিতে পারে না। আনুষ্ঠানিক সালাতের (নামাজের) সময় মানুষের মনে নানা রকম পাপ পূণ্যের ভাব আসিতে পারে তাই আনুষ্ঠানিক সালাত (বা নামাজ) কোন ক্রমেই ঘুম হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। ঘুমে মানুষ পাপ পূণ্যের ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ প্রশান্তিতে বাস করে। সেখানে মনের কোন কালিমা স্থান পায় না। তাই আনুষ্ঠানিক সালাত (বা নামাজ) কোন ক্রমেই ঘুম হইতে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হইতে পারে না। আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টার নাম সালাত। গভীর ধ্যানের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব।

তাই হুজুর (আ.)-কে আমরা হেরা গুহায় ১৫ (পনের) বৎসর ধ্যানে নিমগ্ন দেখিতে পাই। আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইহাই তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসার বিরাগী আসহাবে সূফ্‌ফারা মদিনার মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) অবস্থান লইয়া নবীর নির্দেশে ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। নবীর উসিলায় যাহা পাইতেন তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেন। এই সকল দরিদ্র ধ্যানী

---

* নামাজ ফারসি শব্দ, সালাত আরবী শব্দ, সালাত অর্থ যোগাযোগ, আল্লার সহিত যোগাযোগ প্রচেষ্টার নাম সালাত,

লোক হইতে সালমান ফারসি, আবুজার গিফারি ও বেলালের মত মহান সাধক তৈরি হইয়াছিল।

তারবিয়াত থেকেই তারাবি আসিয়াছে। 'তারবিয়াত অর্থ ধীর, স্থির ভাব। এই সালাত ধীর, স্থির ভাবে রসুল (আ.) দুই রাকাত অথবা খুব বেশী হলে চার রাকাত পালন করিয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে তিনি দুই রাকাতে আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টা পার করিয়া দিয়াছেন ধ্যানে। এই নামাজ (বা সালাত) ঐচ্ছিক না পড়িলে কোন দোষ নাই। সারাদিন রোজা রাখার পর সম্ভব হইলে দুই রাকাত কিংবা চার রাকাত ধ্যানের সহিত আল্লাহর সহিত যোগাযোগের নামাজ (বা সালাত) আদায়ের কথা বলা হইয়াছে।

হুজুর (আ.) চার রাকাতের বেশী তারাবির নামাজ (বা সালাত) আদায় করেন নাই। আমাদের দেশে ঢাকার বংশালে আহ্‌লে হাদিসরা আট রাকাতের বেশী তারাবির নামাজ পড়ে না। বিশ রাকাত তারাবির নামাজ হযরত ওমর (রা.) শত নববিধানের ১টি। ধ্যান ব্যতিরেকে এইভাবে মেশিনের মতো উঠাবসা করিলে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ কতটুকু সম্ভব? ধ্যান-সাধনা বাদ দিয়া অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত ওমরের (রা.) ইহা একটি ব্যবস্থাপত্র।

বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করিয়া এহরাম বস্ত্র পরিধান অবস্থায় নবী তাঁহারই মতো একজন ধ্যানী সাধককে ১৮ জিলহজ্ব ১০ হিজরি, ২১ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে গাদিরে খুমে তাঁহার উত্তরাধিকারী আলী (আ.)-কে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়া সোয়ালক্ষ সাহাবীকে তাঁহার নিকট বায়াত গ্রহণ করাইয়া গিয়াছিলেন। একজন উপযুক্ত নেতা বা রাজা কখনই তাঁহার উত্তরাধিকারী নিয়োগ না করিয়া জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যান না। নবীও আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর ধ্যান-সাধনা বিরোধী দুনিয়াদার অনুষ্ঠানবাদীরা মদিনা হইতে ৬ মাইল দূরে বনি সাকিফা নামক এক বস্তিতে গিয়া নামমাত্র ইলেকসান তথা ক্ষুদ্র নির্বাচনের মাধ্যমে আবুবকর (রা.) কে তাহাদের নেতা বানাইয়া মদিনার ক্ষমতা দখল করিল।

নবী রসুলদের উত্তরাধিকারী কিংবা ধ্যানী সাধকদের উত্তরাধিকারী কখনই ইলেকসান করিয়া বানান যায় না। হুজুর (আ.) বলিয়াছেন,

"আনা ওয়া আলীউন মিন নূরিল ওয়াহেদ" (অর্থাৎ আমি ও আলী একই মহানূরের দুই টুকরা)। **যেখানে মোহাম্মদ (আ.) ও আলী একই নূরের দুই টুকরা, সেই আলী (আ.) কে মাওলা মোহাম্মদ (আ.) তাঁহার পরবর্তী মোমিনদের প্রতিনিধি বানাইয়া গিয়াছিলেন।** যাহাতে আলী (আ.) জনগণকে আল্লাহর পথে পরিচালনা করিয়া আল্লাহওয়ালা মহামানব বানাইতে পারেন।

নবী রসুলগণ জাগতিক ক্ষমতার ধার ধারেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই মাওলা আলী (আ.) আবুবকর, ওমর (রা.) কে সরাইয়া ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টা করেন নাই। ক্ষমতা দখল দুনিয়াদার জাগতিক লোকের কাজ। মাওলা আলী (আ.) জনগণের মধ্যে আল্লাহ ভাব জাগ্রত করিবার কাজে নিয়োজিত রহিলেন। যেন মানুষ আল্লাহওয়ালা হইতে পারে। তাই দেখা যায়, তিন খলিফার রাজত্ব কালে মাওলা আলী শেরে খোদা (আ.) কখনই অস্ত্র ধরেন নাই।

সর্বযুগেই সমাজের সাধারণ মানুষ ধন-সম্পদ উপার্জন ও সামান্য কিছু অনুষ্ঠান ধর্ম পালন করিয়াই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এবং নিজেকে ধার্মিক বলিয়া জাহের করিতে ভালবাসে বা পছন্দ করে। সে যাহা বুঝে তাহাই আল্লাহর ধর্ম বলিয়া মনে করে। আল্লাহর ধর্মের নিগূঢ় রহস্য এবং আল্লাহর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিবার ধার ধারে না। আল্লাহ কি মহান উদ্দেশ্য লইয়া এই মহাসৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন তাহার ধারে কাছেও যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে না। আল্লাহ নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে লীন করিয়া নিজেই যে রূপে-রূপান্তরিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তাঁহারই বিকাশ ঘটাইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন তাহা বুঝিবার ধার-ধারেনা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনিই যে বিকশিত, মানবরূপে (অলি-আল্লাহরূপে) জাহের হইয়া চলিয়াছেন। **ধর্ম-কর্মের মাধ্যমে মানুষ যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং তাহার (মানুষের নিজের) মধ্যে আল্লাহকে বিকশিত করিতে পারে, তাহারই বিধান প্রতিটি ধর্মের মধ্যে দান করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ অনুষ্ঠানকে ধর্ম মনে করিয়া তাহার মধ্যে আল্লাহকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করে না।** ফলে সে ধর্মের গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া দুনিয়াতে অনুষ্ঠান ধর্ম লইয়া ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে।

এইভাবে যুগে যুগে প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাহার আদর্শচ্যুত হইয়া সমাজ এবং জাতিকে বিপথগামী করিতেছে। ঐরূপেই প্রতিটি মানুষ সৃষ্টির মধ্যে ধরা খাইয়া যাইতেছে এবং নিজ মুক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যিনি 'লা' অবস্থায় বাস করেন তিনি আল্লাহ, সমস্ত বস্তু তথা আমিত্বের ঊর্ধ্বে বাস করেন। অর্থ সম্পদের উপর নির্ভর, সন্তান-সন্ততির উপর নির্ভর, জাতি, গুষ্ঠি, সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর, ঘর-বাড়ির উপর নির্ভর এক কথায় বস্তুবাদী মানুষ যাহার উপর নির্ভরের আস্থা স্থাপন করে; তিনি তাঁহার ঊর্ধ্বে বাস করেন। শেরেক মুক্ত লোকই অলি-আল্লাহ, কোন কিছুর উপর নির্ভরের নামই শেরেক। শেরেক মুক্ত হইয়া বাস করা আমাদের মত বস্তুবাদী সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

প্রতিটি ধর্মই নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে মানুষকে শেরেক মুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেছে। আমরা বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বানিজ্য, সন্তান-সন্ততি, চাকরি-বাকরি এক কথায় যাহা কিছুর উপর নির্ভরের আস্থা স্থাপন করি তাহাই শেরেক। শেরেক মুক্ত লোকই লা অবস্থায় বাস করে এবং তাঁরাই আল্লাহ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। **সবকিছু উপর 'লা' অবস্থায় বাস করা ব্যক্তিগণই আল্লাহ বা অলি-আল্লাহ। শেরেক অর্থ আমিত্বের উপর নির্ভর। আমার আমি যাহাকিছুর উপর নির্ভর করে তাহাই শেরেক।** শেরেক মুক্ত ব্যক্তিগণই আল্লাহ বা অলি-আল্লাহ। নিরাকার আল্লাহ নিজেকে এইভাবে সমাজে জাহের করিয়া থাকেন নবী, রসুল, অলি-আল্লাহরূপে।

"সাহারা রামজানাল লাজি উনজেলা ফিল কুরআন" অর্থ, রমজান মাসে কোরআন নাযিল হয়। কিন্তু আমরা জানি রাসুল (আ.) জীবনভর ধীরে ধীরে যখন যা প্রয়োজন সেই অনুসারে কোরআন নাযেল হইয়াছে। কিন্তু কোরআন বলিতেছে রমজান মাসে কোরআন নাযিল হয়। এটা কোন কোরআন? আল্লাহপাকের বিকাশ বিজ্ঞানের নাম কোরআন। এই কোরআন মোমেনের উপর নাযেল হয়। মোমেন নূরে-মোহাম্মদী প্রাপ্ত হইয়া আল্লার নূরে লীন হইয়া আদম রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাই তিনি সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান তথা কোরআন জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা তাহার করায়ত্ব

নয়। তাই কোরান ঘোষণা করিতেছে এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা কোরানে নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কাগজের যে বই কোরান আমাদের নিকট আছে তাহাতে আইনস্টাইনের অ্যাটমিক থিয়রী, রকেট চালানো এবং তৈরি করার বিশেষ পদ্ধতি এবং জ্ঞান আমরা কাগজের কোরানে কোথাও দেখিতে পাই না। কাগজের কোরান মানুষকে মোমেন হওয়ার জ্ঞান দান করে। ইহা অনুসরণ করিয়া সাধারণ মানুষ নূরে-মোহাম্মদী প্রাপ্ত হইয়া আদমরূপ ধারণ করিয়া আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হইয়া সমস্ত সৃষ্টির কর্তা হইয়া সামাদ আল্লাহ হইয়া যায় তথা অলি-আল্লাহ হয়। তদুপরি সে কোরানের জ্ঞান তথা আল্লাহপাকের বিকাশ বিজ্ঞানের জ্ঞানের মালিক হইয়া যায়। আল্লাহপাকের বিকাশ বিজ্ঞানের নামই কোরান।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকার নাম সিয়াম নয়। আত্মসুদ্ধির প্রচেষ্টার নাম সিয়াম। সিয়ামের মাধ্যমে মানুষের আত্মপরিচয় ঘটে।

রমজান মাসে মোমিনের চরম সাধনায় ফলে তাহার উপর কোরান নাযেল হয়, তাহার ফাতারা (উদঘাটন) তথা নূরে মোহাম্মদীর উদ্‌ঘাটন হইয়া তাহার ইফতার হইয়া যায়, তথা আল্লাহপ্রাপ্তি হইয়া যায়। ফাতারা তথা নূরে-মোহাম্মদীর উদ্‌ঘাটন হয়। "আল্লাহ ফাতেরুস সামায়াতে অল আর্দ" (অর্থ, আল্লাহ আসমান (মনলোক) ও জমিন (দেহ) উদ্‌ঘাটনকারী।

ফাতারা হইতেই ইফতার আসিয়াছে। ফাতারা হইতেই ঈদুল ফিতর। (ফিতরের ঈদ বা উৎসব) কোন ব্যক্তির ইফতার হইয়া গেলে (আল্লাহপ্রাপ্তি হইয়া গেলে) তাহার ইফতার এর আনন্দই ঈদুল ফিতর। সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া আমরা সকলে ঈদুল ফিতরের উৎসব পালন করিয়া থাকি যেন সেই ব্যক্তির (ঈফতার প্রাপ্ত ব্যক্তির) মত আমরাও যেন ইফতার প্রাপ্ত হইয়া মহান আল্লার রঙে নিজেকে রাঙাইয়া নিজেরা সামাদ আল্লাহ হইতে পারি। ইফতারে (আল্লাহপ্রাপ্তিতে) যে যত বেশি তাড়াতাড়ি করে, আল্লাহ তাহাকে তত বেশি পছন্দ করেন। আল্লাওয়ালা হওয়ার সাধনার মাসই রমজান মাস। এই মাসের চরম সাধনার ফলেই আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটে।

কোরবানিও তদ্রূপ আমিত্বের তথা চিত্তবৃত্তির উৎসর্গ। কুরবানি পশু জবাই ক্রিয়া নয়। আল্লার রাহে নিজেকে উৎসর্গ করার নামই কুরবানি। আদি থেকে আজ পর্যন্ত সব জাতির মধ্যেই কুরবানি প্রচলিত ছিল এবং আছে। আমিত্ব তথা চিত্তবৃত্তির আল্লার কাছে উৎসর্গের নামই কুরবানি। ধনী-নির্ধন সবার জন্যই আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য কুরবানি (নিজেকে আল্লার রাহে উৎসর্গ (কতল) করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। নবী ইব্রাহিম (আ.) নূরে-মোহাম্মদী প্রাপ্ত মহান ব্যক্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির কর্তা। তিনি তাহার সন্তান ইসমাইল (আ.)-কে তাহার মত উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিয়া) জগত ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। (কতল করিয়াছিলেন)। কোন সন্তানকে আল্লার রাহে রাঙাইয়া (উপযুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া) হত্যা করার মধ্যে জগত ও জাতির কোন কল্যাণ হয় না। বরং জ্ঞানী লোকের হত্যার দ্বারা জগত ও জাতি তাহার অর্জিত মহাজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। কতল অর্থ কাফশক্তি অর্জন করিয়া তথা আল্লার আল্লাহিয়াতের মহাজ্ঞান অর্জন করিয়া জগত ও জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। যাহার দ্বারা জগত ও জাতি মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয়।

আবুবকর ও ওমর (রা.) ক্ষমতা দখল করিয়াই বুঝিতে পারিল ক্ষমতা সুসংহত করিতে হইলে সেনাবাহিনীর দরকার। তাই তারা নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। **যদিও মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (আ.) আদর্শে নিয়মিত সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ। আক্রান্ত হইলেই কেবল আত্মরক্ষার জন্য জেহাদের ডাকে মোজাহেদ বাহিনী গঠন করা যাইবে।** নিজের ইবলিসিয়াত তথা আমিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই প্রকৃত জেহাদ। যে রাষ্ট্র ও জনগণ নিজেদের আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যাপৃত রহিযাছেন ঐরূপ রাষ্ট্র ও জনগণকে যে বা যারা তাহাদের শুদ্ধির পথে বাধা দানকারী তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকেও জেহাদ বলে। তবে ইহাকে জেহাদে আসগর (বা ছোট জেহাদ) বলে। জেহাদে আসগরে (ছোট জেহাদে) মোমিন ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করিতে পারে। (আমিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধই সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেহাদ। **(জেহাদে আকবর)। নেতৃত্ব, মোমিনের (চক্ষুমান নূরে মোহাম্মদীর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির) হাতে না থাকিলে জেহাদ হয় না।**

নবী জনগণকে আত্মিক উন্নতির ট্রেনিং দিয়া মুক্তির দেশে লইয়া যাওয়ার জন্য আসিয়াছেন। দুনিয়াতে মারামারি লুটপাট করার জন্য নয়। নবীর আদর্শের তোয়াক্কা না করিয়া তাহারা সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন (ক্ষুধার্ত লুটেরা) আরব জাতিকে একমাত্র অর্থ দ্বারাই হাত করা যাইবে। কিন্তু নবীর আদর্শে থাকিলে অর্থ পাওয়া সম্ভব নয়। নবী যাকাতের মাধ্যমে যে অর্থ স্থানীয় নেতাদের দ্বারা আদায় করিতেন তাহা স্থানীয়ভাবেই তাহাদের কল্যাণে ব্যয় করিবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থই কেবল কেন্দ্রে পাঠাইতে বলা হইয়াছিল। ফলে কেন্দ্রে খুব কম অর্থই আসিত এবং যাহা কেন্দ্রে জমা হইত তাহা দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিয়া ফেলা হইত, ফলে কেন্দ্রে (মদিনাতে) কোন অর্থ জমা হইত না। আবুবকর (রা.) নেতা হইয়া যাকাতের নামে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। জনগণের অভিভাবকগণ বলিল, আমরা তো যাকাত সংগ্রহ করিয়া তাহা জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়া দিয়াছি; কি করিয়া যাকাতের নামে পুনরায় অর্থ আদায় করিব? কিন্তু সেনাবাহিনী জোর করিয়া অর্থ আদায় করিতে চাহিলে যুদ্ধ বাঁধিল। ইহাকেই যাকাত যুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে জনগণ ইসলাম ত্যাগ করিয়া যাকাত দিতে রাজি হয় নাই। যাকাত যুদ্ধের পর এই দুর্ধর্ষ বাহিনী পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ দেশ পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হইল। পাঁচভাগের একভাগ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিয়া বাকি লুটের অর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার কারণে দলে দলে (ক্ষুধার্ত লুটেরা) আরবের যুবকেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ দেশ লুটপাট করিয়া নিজেরা সম্পদশালী হইতে লাগিল। পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী রাজারা যেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করিত ঠিক একইভাবে অন্যের রাজ্য লুটপাট ও ধ্বংস করিয়া নিজেরা সমৃদ্ধিশালী হইল। যাহা কোন ধর্ম বা মোহাম্মদী ইসলাম সমর্থন করে না।

ধর্ম মানুষের আত্মিক উন্নতির কথা বলিয়া মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লইয়া যায় এবং মানুষকে ভদ্র সুসভ্য ও ভাল মানুষ বানাইয়া থাকে। কোন ধর্মই লুটপাট ও জনপদ ধ্বংসের অনুমোদন

দেয় না। জনপদ ধ্বংস ও লুটপাট অসুর লোকের কাজ। ভাল ও ভদ্র মানুষ কখনই আক্রান্ত না হইলে বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত করিতে এবং অন্যের সহিত ঝগড়া করিতে চান না। আর যাহারা আল্লাহকে পাইতে চায় এবং নিজেরা শুদ্ধ হইতে চায় তাহারা কখনও আক্রান্ত না হইলে অস্ত্র ধরেন না। নবীর শিক্ষাও তাহাই ছিল। **আবুবকর ও ওমর (রা.) নবীর শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করিল ধর্ম বিস্তারের দোহাই দিয়া। ঘটনাচক্রে মাওলা আলী (আ.) ক্ষমতায় আসিয়া সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি ত্যাগ করেন।**

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আসেন দুনিয়াদার জাগতিক লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া আল্লাওয়ালা বানাইবার জন্য। মানুষের ভিতরেই যে মহাপ্রভু বিরাজিত তাহা অবগত করাইয়া এবং তাহাদের শয়তানি ও অসুর ভাব ছাড়াইতে ধরাধামে আসিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায়; দুনিয়াদার ভোগী লোকেরা সুকৌশলে ক্ষমতা দখল করিয়া জনগণকে আবার দুনিয়ামুখী করিয়া লয়।

ধর্মের মধ্যে (নবীর নীতি ও আদর্শের মধ্যে) পরিবর্তন আনিয়া তাহা নবীর নামেই চালাইয়া দেয়। ওমরের (রা.) শতাধিক নব বিধান মোহাম্মদী আধ্যাত্মবাদী ইসলামকে জাগতিক অনুষ্ঠানবাদী ইসলামে পরিণত করিয়াছে। তাহারা জনগণকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে যে দুই চারটা সাধারণ আনুষ্ঠান করিলেই চলিবে। নিজেকে চেনা, ধ্যান-সাধনা করা, আত্মপরিচয় জানা, অতিমানব হওয়ার দরকার নাই। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিয়া নিজের ভোগ বিলাস ষোল আনা বুঝিয়া সামান্য কিছু দরিদ্র জনগণকে দিলেই ভগবান তথা আল্লাহ মহাখুশি। মানুষের মাঝেই আল্লাহ বিরাজিত। মানুষকে সন্তুষ্ট করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি এসব কথা কাগজে কলমে লিখা থাকিলেই চলিবে। ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে এইগুলির দরকার নাই। অনুষ্ঠান ধর্ম পালন কর ভগবান তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন। জনগণের দিকে তাকাইবার দরকার নাই। কারণ জনগণের দিকে তাকাইতে গেলে লক্ষপতি, কোটিপতি হওয়া যায় না। শোষণ এবং বঞ্চনা করা যায় না। কোরান বলিতেছে, "ওয়াকিমুস সালাত ওয়া তুজ

যাকাত" সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও। আল্লাহর সহিত যোগাযোগকেই কোরানে সালাত বলা হইয়াছে। আমিত্ব তথা চিত্তবৃত্তির সর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়া না পর্যন্ত যাকাত হয় না। নিজের সর্বস্ব আল্লাহর রাহে বিলাইয়া দেওয়ার নামই যাকাত। সালাত ও যাকাত পূর্ণ করিলে আল্লাহ তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠেন। সর্বস্ব বিলাইয়া না দিলে নিজের বলিয়া আমিত্বের কিছু থাকা অবস্থায় তাহার মধ্যে আল্লাহ জাগ্রত হইয়া উঠেন না। তাই সালাত ও যাকাতের তাগিদ কোরানে বার বার দেওয়া হইয়াছে আল্লাহ প্রাপ্তি জন্য। শতকরা আড়াই ভাগ ট্যাক্স যাহা মোহাম্মদ (আ) এঁর সময়ে যাকাত নাম দেওয়া হইয়াছিল। কোরানের যাকাত ও রাষ্ট্রিয় ট্যাক্স যাকাত এক নয়। সেই সময় ভূমি, পশু ও সামান্য কিছু পণ্যের তেজারতি ছিল।

বর্তমান যুগের মত ট্যাক্সের বিভিন্ন দিক ছিল না। এখন সরকার প্রতিটি পণ্যের উপর ভ্যাট তথা ট্যাক্স আদায় করিতেছে। একটা সিগারেটের উপর ও ভ্যাট বা ট্যাক্স আছে। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ট্যাক্স বর্তমান যুগে জনগণ দিয়া থাকে।

হুজুর (আ.) আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মা খাদিজাকে (রা.) বিবাহ করিয়া অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হন। তিনি তাঁর সব সম্পদ মোহাম্মদী ইসলাম প্রচার করিতে যাইয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন। যে দেশে প্রচুর দরিদ্রের বাস সেখানে ধার্মিক হইয়াও ধনী-গণি কীভাবে থাকা যায়। যেখানে বলা হইতেছে পাড়া-প্রতিবেশী এবং দেশের লোককে অভুক্ত রাখিয়া যিনি আহার করেন তিনি মুসলমান নন। সেই ক্ষেত্রে ওসমান গণি (ধনবান) হন কীভাবে। গণি হওয়াতো প্রশ্নই উঠে না। সবাইকে দিয়া দুইবেলা দুইমুঠ খাবার খাওয়াই তো কঠিন ব্যাপার। সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে আমরাও কতটুকু মুসলমান?

নবী মোহাম্মদ (আ.) আরবের সবচেয়ে বড় কোরাইশ সরদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বযুগেই যারা সরদার হন তারা ধনী এবং সচ্ছল ব্যক্তি হইয়া থাকেন। তাহা না হইলে জনগণ তাহাদেরকে মান্য করে না। এই রকম সচ্ছল এবং ধনী পরিবারের সদ্যজাত শিশুকে কি করিয়া অপরিচিত বেদুইন ধাত্রীর কাছে দেওয়া যাইতে পারে এবং মা কি করিয়া সদ্যজাত শিশুকে অন্য লোকের কাছে

দিতে পারেন। সদ্যজাত শিশু মা ছাড়া পরিপূর্ণ পরিচর্যাও ভালবাসা অপরিচিত লোকের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। ধাত্রীকে নিজ গৃহে রাখিয়া শিশুর পরিচর্যা করান যাইতে পারে। তাহাকে কি করিয়া অন্যের কাছে দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত আরবের অন্য কোন লোকের ব্যাপারে আমরা জানতে পারিনা যে তাহাকে জন্মের পরই ধাত্রীর কাছে লালন পালনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহা একটি উদ্ভট ও অবাস্তব ব্যাপার। জঙ্গলের পশুও তার বাচ্চাকে জন্মের পরই অন্য কারো কাছে দেয় না বা ফেলিয়া যায় না।

যে জাতি মোহাম্মদ (আ.) ও মা ফাতেমার চির দুশমন। মা ফাতেমার (আ.) এবং আলী (আ.) এঁর বংশকে কারবালয় ধ্বংস করিয়াছিল এবং ৩০ বৎসর পর্যন্ত তাহাদের বংশের উপর লানত বা অভিশাপ দিত। তাহাদের রাজত্ব কালেই মোহাম্মদ (আ.) এঁর উপর এই রকম উদ্ভট ও বানোয়াট গল্প বানান এবং দুশমনি করা সম্ভব হইয়াছিল। আরবের কোথাও এবং কখনও জন্মের পরই সন্তানকে লালন পালনের জন্য অন্য লোকের নিকট দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। এবং কোন একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় না। ধাত্রী হালিমা একটি বানোয়াট কাহিনী এবং মোহাম্মদ (আ.) এঁর বাল্য জীবনকে আড়াল করার একটি অপচেষ্টা ব্যতীত কি আর হইতে পারে। নবীগণ কখনও আপন মা ব্যতীত অন্য রমনীর দুধপান করিতে পারেন না। ইহা আমরা মুসা (আ.) এঁর বেলায়ও দেখিতে পাই। তাঁহার মা ধাত্রী বেশে ফেরাউনের বাসায় নবী মুসাকে (আ.) দুধপান করাইয়া ছিলেন। অন্য নারীর দুধপান তিনি (মুসা আ) করেন নাই। কিন্তু হুজুর (আ.) কে কাফের রমণি হালিমার দুধপান করাইয়া তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পরবর্তীকালে দুশমন রাজাদের একটি অপচেষ্টা।

মোহাম্মদী ধর্মের খোলস রাখিয়া ভিতরের মাল সরাইয়া ফেলিয়া (আধ্যাত্মবাদ বাদ দিয়া) ইহাকে একটি কাষ্ঠ সৈনিকের ধর্মে পরিণত করা হইয়াছে। কোরানে মোমিনদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, কাফেরকে ধর এবং বাঁধ, আস্তে আস্তে বাঁধন শক্ত কর এরপর সে যদি 'কতল' হইতে চায় তবে তাকে কতল কর। মোমিন নূরে-মোহাম্মদী

নূর অর্জন করিয়া মহা নূরের অধিকারী হইয়া আল্লাহতে লীন হইয়া গিয়াছেন। তাই তাহাকে বলা হইতেছে, তুমি যে মহা নূরের অধিকারী হইলে তাহা অন্যকেও দান করার ব্যবস্থা নাও।

'কাফফারা' অর্থ ঢাকিয়া রাখা। যে ব্যক্তি নিজের মাঝে আল্লাহকে ঢাকিয়া রাখে সে-ই কাফের। প্রতিটি মানুষের মাঝে নূররূপে সেই আল্লাহকে যে জাগ্রত করার চেষ্টা না করে, নিজের মধ্যে ঢাকিয়া রাখে সেই কাফের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করিলে আমরা প্রত্যেকে কমবেশি কাফের। আল্লাহর আল্লাহহিয়াতের মধ্যে লীন হওয়ার যোগ্যতা দান করিয়া প্রতিটি মানুষকে তৈরি করা হইয়াছে।

যুগে যুগে নবী, রসুল মহাপুরুষগণ মানুষকে কাফের অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া মহামানব বানাইবার জন্যই জগতে প্রেরিত হইয়াছেন। তাই মহাপুরুষ তথা মোমিনদের বলা হইতেছে, **"কাফেরকে তথা সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দ্বারা ধর, আস্তে আস্তে প্রেম দ্বারা তাহাদের সহিত বন্ধন শক্ত কর, এরপর সে যখন জ্ঞানের মর্ম তথা তাহার ভিতরের আল্লাহশক্তি সম্বন্ধে অবগত হইয়া উহা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবে তখন তাহাকে কতল কর।" অর্থাৎ জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মহান নূরে-মোহাম্মদীর অধিকারী বানাইয়া দাও।** قَتْل (কতল) ক্বাফশক্তির বিস্তারের মাধ্যমে তথা তাহার ভিতর আল্লাহশক্তি বিস্তারের মাধ্যমে তাহার ভিতরের আমিত্বের সবকিছুকে 'লা' করা। 'ক্বাফ' দ্বারা ক্বাফশক্তি তথা আল্লাহহিয়াত বুঝানো হইয়াছে। 'তে' দ্বারা বিস্তার ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। 'লাম' দ্বারা লা বা নাই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। সবকিছুই লা বা না করা, সবকিছুর উপর নির্ভরের ভাব ত্যাগ করিয়া (লা বা না করিয়া) আল্লাহর উপর ষোল আনা নির্ভর করা। আমার আমি বলিতে যাহাকিছু আছে– লোভ, লালসা, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, বাড়ি-গাড়ি, নারী, সন্তান-সন্ততির প্রভাব পতিপত্তি এক কথায় আমার আমি যাহার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে লা করা অর্থাৎ সবকিছুর উপর নির্ভরের ভাব মন হইতে ষোল আনা ত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এই নির্ভরের ভাব ত্যাগ করা অতীব কঠিন কাজ। মুখে বলা সহজ কাজে পরিণত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই নির্ভর ত্যাগ করিতে

পারিলেই কেবল আল্লাহ তথা নূরে-মোহাম্মদী মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইয়া মানুষকে মহান মোমিন তথা অলি-আল্লাহ, মহান সাধক আল্লাহ বানাইয়া দেয়। মোমিনের অন্তর আল্লাহর আর্শ (আসন) (কুলুবুল মোমেনিনা আর্শ আল্লা) কতল করা তথা মোমিন বানানো একজন মোমিনের পক্ষে অতীব কঠিন কাজ। মোমিনের নির্দেশে চলিয়া তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হইলেই কেবল একজন কাফের 'কতল' অর্থাৎ মোমিন হইতে পারে। আর যদি কতল অর্থাৎ হত্যা করা বুঝায় তবে কে চাহিবে যে তাহাকে কেহ ধরুক এবং আস্তে আস্তে শক্ত করিয়া বাঁধুক এবং হত্যা করুক।

মোমিনের উপর নির্দেশ, "কাফেরকে যেখানে পাও তাহাকে ধর এবং আস্তে আস্তে শক্ত করিয়া বাঁধ এবং কতল কর।" মোমিন একজন সহজ সরল নিরীহ সাধু ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে মারামারি খুনাখুনি করা অসম্ভব ব্যাপার। অসুর ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোকেরাই মারামারি, খুনাখুনিতে পারদর্শী। আল্লাহর ধর্ম কখনও মারামারি, খুনাখুনির অনুমোদন দিতে পারে না। ঘটনাচক্রে আক্রান্ত হইলেই কেবল নিরীহ সাধু ব্যক্তিরা অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হন নিজের আত্মরক্ষার জন্য। মানুষ হত্যা করার চেয়ে বড় পাপ জগতে আর নাই।

হুজুর (আ.) মোহাম্মদী ইসলামকে একটা সাম্যবাদী কাঠামোর উপর গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। মাওলা আলী (আ.) ও সেই নীতি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আরবের সরদার প্রধান এবং ধনী লোকেরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারে নাই। ধনী-নির্ধন সবাইকে সমমর্যাদা দান এবং হীন দরিদ্র আস্হাবে সুফ্ফাকে মর্যাদার আসনে বসান। আরবের ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোক বরদাস্ত করিতে পারে নাই। মক্কার সরদার আবু সুফিয়ান এবং তাহার ছেলে মা'বিয়া মক্কা বিজয়ের পর বাধ্য হইয়া মোহাম্মদ (আ.) দলে আসিল। মক্কা জয়ের পর হুজুর (আ.) মদিনায় চলিয়া আসেন। মা'বিয়া সেই সময় মক্কাই ছিল। মক্কা বিজয়ের এক বৎসর পর হুজুর (আ.) দেহত্যাগ করেন। এই এক বৎসরের মধ্যে মা'বিয়া কি করিয়া কাতেবুল অহি বা অহি লেখক হয়। এই সকল বানানো ও সাজানো হাদিস। পরবর্তীকালে উমাইয়া রাজারা (খলিফা) মিথ্যা হাদিস প্রচার করিয়া মা'বিয়া ও তাহার বাবার (রাজাদের পূর্ব পুরুষদের) কুকীর্তিকলাপ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

হযরত ওমর (রা.) তাহার অনুগত উমাইয়া ধনী সুবিধাবাদী লোকদের রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে নিয়োগ দেন। এই সময় তিনি মা'বিয়াকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেন। এইভাবে সরদার ও ধনী শ্রেণী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিল।

হযরত ওমর (রা.) দরিদ্র আস্হাবে সুফ্ফাদের (সাধক শ্রেণীকে) পরিহার করিয়া বাদ দিয়া এমনকি আবুজার গিফারির মত মহান (সাহাবী) লোকদেরকে মদিনা হইতে বহিষ্কার করেন। নিজেকে ধার্মিক ও সাধক দেখাইবার জন্য দরিদ্র বেশে থাকিয়া জনগণকে ধোঁকা বা ভাঁওতা দিয়াছেন। যে রূপ ভাঁওতা নিষ্ঠুর আব্বাসীয় খলিফা (রাজা) আল মনসুর দিয়াছিল। এইরূপ ভাঁওতা দিবার ফলেই তাহার শতাধিক নববিধান [যাহা হুজুর (আ.) নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপত্রকে বদলাইয়া] হযরত ওমর তাহার মনগড়া বিধান চালু করিয়া আধ্যাত্মবাদ বাদ দিয়া অনুষ্ঠান ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী ধনী দেশ পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য লুটপাট ও জয় করিয়া তিনি হীন দরিদ্র লুটেরা আরব জাতিকে লুটপাটের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে সুবিধাবাদী জনগণ তাহার পক্ষে ছিল। আধ্যাত্মবাদকে বাদ দিয়া অনুষ্ঠান ধর্মকে গ্রহণ করিয়া ইহাকে একটি সৈনিকের ধর্মে পরিণত করেন। হযরত ওমর এবং ওসমান (রা.) মৃত্যুর পর তাহাদের অধিকারে থাকা শত শত স্বর্ণ মুদ্রা তাহার উত্তরাধিকারীরা (সন্তান-সন্ততিরা) পাইয়াছিল। ঘটনাচক্রে মাওলা আলী (আ.) (সাধক শ্রেণীর নেতা) ক্ষমতায় আসিয়াও স্বার্থান্বেষী নেতাদের বিরোধিতা এবং তাহাদের নেতা মা'বিয়ার বিরুদ্ধাচরণের ফলে ব্যর্থ হইয়া যান এবং তাহাদের দ্বারা শহীদ হন। মা'বিয়া ক্ষমতায় গিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

এইভাবে দেখা যায়, সমাজের স্বার্থান্বেষী ধনী লোকেরা কোন কালেই নবী, রসুল ও সাধক শ্রেণীয় আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। নবী, রসুল ও সাধক শ্রেণী ক্ষমতায় গেলেও তাহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে হটাইয়া ধনী শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করিয়া ধর্মের এবং রাষ্ট্রের কর্তা হইয়া বসিয়াছে এবং ধর্মকে তাহাদের মনমত (এমেণ্ডমেন্ট) বদল করিয়া লইয়াছে। ইহাই আজ ধর্মীয় সমাজের অবস্থা। তাই বর্তমানে মুক্ত চিন্তার লোকেরা ধর্মের মধ্যে নানা গলদ ও

এক ধর্মাবলম্বী লোকের অন্য ধর্মের প্রতি কুৎসা রটনা এবং তাহাদের ধর্মীয় নেতাদের হীনমন্যতা দেখিয়া আজ ধর্মকেই বাদ দিয়া চলিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকে।

যুগে যুগে নবী, রসুল ও অলি-আল্লাহগণই মানুষকে ন্যায়-নীতি এবং আদর্শ শিখাইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আজ যে সভ্যতা আমরা দেখিতে পাই মানুষের নম্রতা-ভদ্রতা এবং ন্যায়-নীতি যাহাই দেখি না কেন তাহা ধর্মেরই অবদান। বর্তমানে সুবিধাবাদী ধর্মীয় পণ্ডিতদের দেখিয়া এবং তাহাদের স্বার্থবাদী এবং আমিত্ববাদী কথা শুনিয়া ধর্মকে হেয় মনে করার কারণ থাকিতে পারে না। আল্লাহর ধর্ম সবসময়ই মানুষকে মহান বানাইবার ব্যবস্থাপত্র দিয়া থাকে। ঢিলা, কুলুপ ও পর্দার নামে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা ধর্মের কাজ নয়।

ধর্ম মানুষকে সহনশীল এবং সাম্প্রদাইকতার ঊর্ধ্বে উঠাইয়া কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া উদার মানুষে পরিণত করে। সব ধর্মের ইহাই সারকথা। হে মানুষ, আমি (আল্লাহ) তোমার মধ্যে আছি আমাকে চিনিতে এবং জানিতে চেষ্টা কর। 'আমি' আল্লাহকে চিনিতে ও জানিতে চাহিলে তোমার নিজেকেই জানিতে এবং চিনিতে হইবে। "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" (যে নিজেকে চিনিয়াছে নিশ্চয়ই সে তাঁর রবকে চিনিয়াছে)। ইহাই সকল ধর্মের মূল কথা।

গুরু বা পীর কে?

নূরে-মোহাম্মদী অর্জন করিয়া যিনি মহামানব হইয়াছেন তিনিই সম্যক গুরু বা পীর। সম্যক গুরু নূরে-মোহাম্মদীপ্রাপ্ত হইয়া আদমরূপ ধারণ করিয়াছেন তাই তিনি সমগ্র সৃষ্টির সেজদার যোগ্য। এই আদমরূপের মাঝে আল্লাহ জাগ্রত।

তাই লালন সাঁইজি বলিয়াছেন, "যেহি মুর্শিদ সেই তো রসুল ইহাতে নাই কোন ভুল খোদাও সে হয়; লালন কয় না এ কথা কোরানে কয়।" সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মাওলানা রুমি বলিয়াছেন, "পীরে জাতে খোদা একনা দেখ নাই মুরিদ, নাই মুরিদ, নাই মুরিদ।" অর্থাৎ পীর ও খোদার জাত যে এক না দেখে, সে মুরিদ নয়, সে মুরিদ নয়, সে মুরিদ নয়। আল্লাহ নূরে-মোহাম্মদীরূপে সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

হুজুর (আ.) এঁর এই হাদিসে তাহা প্রমাণ করে "আনা মিন নূর আল্লা কুল্লে সাইইন মিন নূরি" অর্থাৎ আমি আল্লাহর নূর হইতে আমা হইতে সমস্ত সৃষ্টি। এই নূরে-মোহাম্মদী অর্জন করিয়া মানুষ যাহাতে আল্লাহর প্রতিনিধি হইতে পারে। এই জন্যই যুগে যুগে নবী, রসুল, অলি-আল্লাহদের পাঠান হইতেছে। নবী, রসুল অলি-আল্লাহগণ এই নূরের মালিক হইয়া, জনগণকে সেই নূর সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইয়া, মানবের মাঝের সেই নূরকে জাগ্রত করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া, সাধারণ মানবকে আদম (বা আল্লাওয়ালা) বানাইবার কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন। সাধারণ মানবের আল্লাওয়ালা বানাইবার পথে প্রধান বাধা তাহার আমিত্ব সত্তা তথা ইবলিস সত্তা। যিনি নিজের আমিত্বকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছেন তিনি আদম তথা আল্লাহ সত্তা। এই ধরনের আদম পর্যায়ের ব্যক্তিরাই সম্যক গুরু, কামেল মুর্শিদ বা অলি-আল্লাহ। সবার পক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিদের চেনাও অতীব কঠিন কাজ। আমরা সাধারণ মানুষেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের

গুরু বা মুর্শিদ (পীর) রূপে ধরি জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এইসব নারীগুরুদের অনুসরণ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে পুরুষগুরু সম্বন্ধে অবগত হইয়া নিজদিগকে পুরুষগুরুতে রূপান্তরিত করিতে পারিব।

ধর্মবিজ্ঞানে দৈহিক নারী ও পুরুষ উভয়কেই নারী (প্রকৃতি) হিসাবে গণ্য করা হয়। ধর্মবিজ্ঞানে পুরুষ সেই ব্যক্তি যিনি নূরে-মোহাম্মদী অর্জন করিয়া মহান হইয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে মা ফাতেমা (আ.), মা মরিয়ম (আ.) পুরুষ এবং আমরা দৈহিকভাবে সাধরণ পুরুষ যারা তারা নারী। বা প্রকৃতি। নূরে-মোহাম্মদী অর্জন করা না পর্যন্ত কেহই পুরুষ হয় না।

প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ পার না হইয়া কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পাইতে চাহিলে তাহাকে অবশ্যই প্রথমে প্রাইমারি পার হইয়া আসিতে হইবে। মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের চেষ্টার ফলে নিজদিগকে পরিবর্তিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের আমিত্বের লয় ঘটাইয়া তাহার ভিতরের আল্লাহ সত্তাকে জাগ্রত করিয়া থাকে। পুরুষ গুরু (নবী, রসুল অলি-আল্লাহ) গণই মানুষের আমিত্বের (তথা ইবলিসের) লয় ঘটাইয়া তাহার (মানুষের) ভিতরের আল্লাহভাবকে জাগ্রত করিয়া নূরে-মোহাম্মদীর আলোয় আলোকিত করিয়া আদম বানাইয়া, সৃষ্টির কর্তা বানাইয়া (তোলে) দেয়।

কাজী নজরুল ইসলাম বলিতেছেন, "তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।" তৌহিদ সাগরে মুর্শিদই মোহাম্মদ।

জগত সংসারে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের মাধ্যমেও স্রষ্টা প্রেম খেলা খেলিয়া চলিয়াছেন। সংস্কৃত আদি ধর্মীয় ভাষা, সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে; স্ব আমি-স্বামী। আমার ভিতরের আমি তথা ভগবানের (আল্লাহর) প্রতীকই হইল স্বামী।

আমার আমিকেই (তথা আল্লাহকেই) স্বামীর প্রতীকরূপে দেখিয়া থাকি। তাই সকাল-সন্ধ্যা স্বামীর সেবা, তার পদধূলি নেওয়া ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। স্বামীর সেবা স্ত্রীর বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। নামাজে দাঁড়ানোর পূর্ব মূহূর্তে স্বামী যদি এক গ্লাস পানি চায় তবে শাস্ত্রে আছে আগে স্বামীকে পানি দিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। নতুবা তাহার নামাজে কল্যাণ লাভ সম্ভব হইবে না।

যখন কোন নারীকে স্বামী হস্তে দেওয়া হয়। পিতামাতা তাহার কর্তব্য পূর্ণ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কারণ তাহার ভগবানের হাতেই তাহাকে তুলিয়া দিয়াছেন।

প্রতিটি মানুষের মাঝেই ভগবান বিরাজিত। সংসার হইতেই এই ট্রেনিং শুরু হয় এবং পরিণামে নিজের মাঝে তাঁহাকে (আল্লাহকে) দর্শনের মাধ্যমে তাহার পরিণতি। এইভাবে দেবতা এবং দেবীরূপে প্রতিটি মানুষকে তৈরি করার জন্য নূরপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিগণ (তথা নবী, রসুল, অলি-আল্লাহগণ) বিধান দান করিয়া থাকেন। লাইলি মজনুর গল্পেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। ইহাও একটি আধ্যাত্মবাদী গল্প। মজনু লাইলির প্রেমে এতটাই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সে সর্বত্রই লাইলিকে ছাড়া অন্য কিছুই দেখিতে পায় নাই। এইভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রেমে মত্ত হইয়া দেবতা ও দেবীরূপে নিজদিগকে পরিণত (তৈরি) করিবে। সাধক গুরু প্রেমিক কবি কাজী নজরুলের গানেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই–"লাইলি তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনুগো আঁখি খোল।" লাইলি লাইলি করিতে করিতে মজনু এতটাই মত্তছিল যে আসল দেহ সর্বস্ব লাইলি যখন কাছে আসিয়া বলিল, "আমি লাইলি আসিয়াছি মজনু তুমি আঁখি খুলিয়া দেখ।" মজনু তখন এই বলিতেছে, "আমি আসল লাইলিকে পাইয়া গিয়াছি (তথা আমার ভগবানকে)। এখন দেহ সর্বস্ব লাইলির আর আমার প্রয়োজন নাই। আমার আমিকে (আল্লাহকে) পাইয়া গিয়াছি। দেহসর্বস্ব লাইলিকে লইয়া আমি কি করিব? দেহ তো ক্ষণিকের পতনশীল বস্তু। এইভাবে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর চরম প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বস্তুবাদী মানুষ বস্তুর আকর্ষণে মত্ত হইয়া চরম প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া বস্তু লইয়াই মত্ত আছি। তাই সমাজে দেখা যায় বৈষয়িক কারণে স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে গালিগালাজ করিতেছে। কারণ পশু স্বভাব আমা হইতে যায় নাই। আমি জীবশ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত হইতে পারি নাই। দেখিতে মানব হইলেও আসলে একটা আস্ত পশু।

ধর্মীয় লেবাস বা কোন কিছু দ্বারাই পশু স্বভাবকে ঢাকা যায় না। পশু স্বভাব নিজের মধ্যে থাকিলে তাহা (অটোমেটিকলি) আপনা আপনিই প্রকাশ পাইবে। মানুষকে পশু হইতে আদম (আলোকিত মহাপুরুষ) বানাইবার জন্যই সর্বকালে নবী, রসুল, খাঁটি গুরু, পীর মুর্শিদদের আগমন।

TRINITY

Trinity, the formula of the Book of God, is the doctrine of all divine religions. But the concept of this doctrine has been more or less debased in all the running religions of the world due to misconception, misuse and malpractice of religions.

In fact trinity is (i) God (the Father) (ii) son God that is lord Guru, who is a divine guide to his disciple and (iii) the holy ghost (the disciple himself or herself who is devouted to a Guru, a religious teacher).

In every man there is Allah (the absolute God) latent in him. Allah is internal in man. "Rob", the holy guide of a man is external. And the holy ghost is the human self. When the human self is devoutly attached to a Guru as disciple he is called the "holy ghost" but not an ordinary ghost. A holy ghost is none other than a practitioner for 'Iman' that is for purification.

A son God is none other than a holy purified father who is acting as a guide to his disciples. He must be a living person to whom the disciple is actively attached for his own purification.

A holy ghost, that is a holy spirit, as the common Christians name it to be, is none other than an earnest practitioner who is an angelic spirit under the training of a son God. Ultimately this holy ghost himself becomes a son God. In the Quran son God has been named as "Ale Muhammad" and also as "Ale Rasul".

So the Christians are in confusion about all the three items of their doctrine. This is because they cannot clearly identify their God father with the exact historical personality. That is why they keep Him placed in the sky or in the vacuum.

They could identify the "God son" with their present Lord-Guru but they identify God son or "God the son" with Jessus

Christ, Thus they have dislinked themselves with the Lord-Guru. They cannot link Jessus Christ whom they call "God the son" due to a gap of time, although Jessus was a real and powerful son God in his own time for those who devoutly followed him.

And they are in confusion about the ghost. In reality every Christian, like every other common man of the world is a ghost, who should be purified and gradually made holy, being attached to a holy Guru, a spiritual teacher.

Thus we find that the Christians are confused in each of the three doctrines of their Trinity.

So far the Muslims are concerned we like to comment with all assertions that they do not at all accept the doctrine as religious. On the contrary they regard it as a defamation to religion. This is sheer ignorance and foolish for them. Thus the Muslims in general ignore the very foundation of divine religions arising in man.

In Conclusion, according to Quran, Muhammad is the "God the Father" for all the people of the world, although the people of the world do not recognise him as such. Not to speak of others, even his so called followers are almost all against this truth expressed in the Quran (3:81). All prophets and apostles who came before Muhammad (A) and will be comming after him are his sons, and they are the "son Gods" for the salvation of mankind.

According to Quran those who do not enter into any religious order for their mental purification are all gins (that is ghosts) and so they are unholy, though they are living in human forms both male and female. They are not named as 'Insan' (that is good human beings). In fact all good human beings have owned their goodness directly or indirectly from holy persons and so they are called Nafse-Louama, (that is holy ghost) grossly

called "religious persons". These religious persons of all the religions of the world have been termed as holy ghosts. All the rest are quite unholy, because they have just acquired human form in this present life having been promoted from the animal world, or have come from the ghost-world, but have not yet accepted the admonition of a present Lord-Guru available for them.

In fine consciousness of holy minds exist in three stages. These stages of perfectness is called Trinity. All minds within the fold of this trinity may be called in a looser sense "God" or God heads. God is ever increasing in nature in His stages of Trinity.

It is through this process of the trinity that Oneness of God establishes itself in the minds of man.

Trinity is God condition/Allah condition of a man in His three stages of which the lowest condition is holy ghost condition. All other condition of minds below this is nothing but animal conditions of the Existance.

Consciousness of the whole Existance is in three stages. These stages of awareness in the Existance is called Trinity.

SADAR UDDIN AHMAD CHISTI

SURA FATIHA
AND CONCEPT OF PANTHEISM

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

With the name of Allah, the Rahman, the Rahim.

١۔ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ

1. The Praise is for Allah, Lord Guru of the worlds.

٢۔ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ

2. The Rahman, the Rahim,

٣۔ مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ

3. Master (or King) of the time of Phenomenon (that is Dharma).

٤۔ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ

4. Thee do we serve and to Thee we seek Thine aid.

٥۔ اِهۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ؕ

5. Guide us the way of the firmness.

٦۔ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۙ

6. Way of those upon whom Thou hast bestowed Thy Grace.

٧۔ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ

7. Not (the way) of those upon whom Thy wrath has fallen, and nor of those gone astray continuous.

Short Notes and Commentaries

1. Names of Allah are His coverings. These coverings are containing divine attributes for those who are conscious beings namely men and jins. Jin is the crude form of human being, that is lower class of mankind.

Divine attributes are entering into the human brain as phenomenon through the seven gates or antennas in the forms of sight, sound, tastes, smelling, feeling, speaking & thinking and get taped and attached in the brain.

If we take the teaching of a Rahman who is perfectly a divine person and according to His guidance if we try to avoid the attachments of the phenomenon entering the brain then we shall gradually get released from the material attachments.

The Rahman is the teacher and teachings of release and the Rahim is the release and the person released. To a disciple his Lord Guru is the Rahman at the first stage, and ultimately he appears to be a personified released person, the Rahim.

This sentence may be considered as the gist of the teachings of the Quran as a whole. This is what is contained in the first verse 'Bismilla-her-Rahmaner Rahim".

2. "The praise" that is confirmed praise is for Allah. Allah keeps His direct contact with mankind as Lord Guru the Teachers of the worlds. The Arabic word Al-Alameen means the conscious mental worlds who are capable of following the ethical guidance of Allah as Lord Guru.

So the sphere of activities of a Lord Guru comprises only the worlds of the minds of Man and Jin. He extends His helping hand only to the conscious worlds of Man and Jin. These are the two categories of beings responsible to God for their activities.

The word Rab is generally translated as Lord. It has also the meaning of cherishing and sustaining and bringing to maturity as the original creator. The Absolute Impersonal Lord cares for all the worlds He has been manifested in.

We are not concerned here with the gradual guidance of upliftment of lower beings below human kind. The use of the word Rab is very significant and in the Quran it has two shades of meaning.

One is the Lord Guru in person imparting direct teachings to those who have become his disciples and also taking indirect care for those who have not been admitted themselves to any Lord Guru.

The other is the existence of the Rab in us all, named as 'Ruh'. He is immanent in us, silently taking care of, cherishing and sustaining and never responding from within us till we become His true servants.

3. At the first stage Lord Guru appears to be Rahman and ultimately reveals Himself to His devotee as Rahim, the manifest truth.

4. Each of the Dharmas arising in any of the seven gates of the brain bears a time. The Lord Guru has conquered the time-factor connected with the Dharmas that appear before his senses through any of the gates of the brain. He has become King or Master of the time entailed with the Dharmas. Thus he has become "Purush" and no more "Prakriti"—a masculine and no more a feminine in nature. Only Allah is the "Purush" Other beings are all "Prakriti".

The three verses above is expressing such a Bio-data of Allah with which we are most concerned. The rest of the verses is the expression of our duty pledged to him. So we entreat Him to save us from all defilement of life.

5+6. مستعان (Mustaan) = One who is called upon for help. A perfect Lord Guru.

Mustaan is a person who himself being helped by the Superior Authority helps his disciples directly and closely in order to save them from the impending perils of material attachments and its bondage and other pitfalls of which a disciple is unaware.

نَسْتَعِيْنُ (Nastain) = (O, our Lord Guru) we seek your help, the help of a Mustaan to his disciples.

صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ (Sirat Al Mustaqim) = It is that way of the mind in which mind remains firm and free from all material attachments. 'Sirat Al Mustaqim' means the confirmed way or the way, which is totally neutral to any Dharma originated from or rather approached before the seven gates of human body and mind. Dharmas are impartial. Goodness or badness of any Dharma depends on the process of receiving the same.

In short "Siratum Mustaqim" is the way of a refined mind free from all greed and attachments. This way is the way of Salat. And it is nothing but the mental way of such an abandoning mind, which is free from all sorts of greed and allurements of this phenomenal world. It is the way of such a divine man who cleans his mind and keeps himself free from all attachments good or bad.

"Siratum Mustaqim" is not a broad way or a high way or a straight way as it is generally said to be. Rather it is the way of deep Salat and all-round meditation for seeking the Self under the guidance of a Lord Guru (Rab).

Mental attachment to materialism is "Sirk". And Sirk or such attachment is the root of all sins. We are subject to material allurement and get ourselves assailed and overcome by attachments. We therefore declare to serve our Lord Guru and seek His direct help in order to enable us to tread the way of mental firmness, so that we may float high over all attachments. We seek this Highness to one who has become Ali. Ali is a name of God, because of the fact that He floats over all sorts of material attachments and lives on high. Aim of the life of a true servant of God is to become an Ali.

7. In fine we seek to have guidance on the way of the righteous ones, on whom God has bestowed His Grace due to above mentioned practice of cautions adopted to break through the imprisonment of this worldly life of allurements.

It may be noted that the guidance towards a path is always directly connected with a person. Paths relating to Divine grace is actively connected with a God-head.

On the other way paths relating to wrath is of those all who tread the wrong ways. So the guidance of an enlightened Lord Guru is a must. All paths other than that of Him is a path astray.

God's Grace is open to all. Attachment to a God-head ensures success and attachment to material inclinations leads to wrath, that is punishment and misguidance.

I am sorry for the fact of my failure to make the readers a bit acquainted with the universal depth and all pervading nature of the Sura in short. I hope the reader would search for its wholeness from the short hints of its expression.

Koran is pantheistic in its philosophy. What is Pantheism?

Answer : −All is Allah without any exception. Wahadatul Azud is the system. It means : all is in One Body. Everything is from Him and is in Him. So they are all interdependent and there are so many categories of Allah which has broadly been divided in names : Ahad, Samad and La-Sarik. La-Sarik is the Absolute Existence, the Supreme Power, the Supreme Light, the He and the Him. Nothing is beyond Him. All things of the world of Ahad and persons of the world of Ahad and Samad is His own manifestations as per His own will and plan.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

LA ILAHA ILLALLAHOO MUHAMMADUR RASUL ALLAH.

This is a statement of warning to us so that we do not indulge ourselves in the apparent pleasures of life to the end of it but only upto a certain period of our life. Objects of pleasures of human life in the phenomenal world are all sugar coated poison if no Salat is applied on those matters or phenomenon.

Anything on which we depend upon is our "Ilah". Ilah is of two kinds : Male Ilah and Female Ilah. For persons desirous of release, female ilah is not to be relied upon for long that is to the end of their lives, without taking the help of a male ilah as to the process of reliance upon the items of the female world of Ahad. Because of the fact that we are inhabitant of the world of Ahad, we cannot sustain our lives without depending upon them. So we are to depend upon the guidance of a Samad-Allah in order to detach our mind from all attachments of the world of Ahad, while living in this very world of Ahad, which is full of sorrows and punishments.

A Samad -Allah as a Lord Guru, is the proper guide to mould our character and conduct as to the behaviour we are to adopt to get ourselves mentally released from their attractions.

La = is not, not, no.

ilaha = female ilah, that is things and persons of the phenomenal world on which and on whom we depend upon for our living. Phenomenal world that is the world of "Prakriti" is called "Ahad-Allah", weak Allah (Doon Allah) and this is called the world of punishment.

illallahoo = Excepting male Allah, that is Allah of the stage of Samad Allah. Samad Allah is free from any kind of material attachment. He is perfectly independent and non-attached in mind.

La = Not, with a short "maad" on it means "not for long". In this perspective the meaning is not desirable for long for a person who hopes for release or who wants to be released.

"Maad" is a technical sign with a definite meaning. It is of two kinds : (a) short Maad and (b) long Maad. Short Maad indicates long time. Long Maad indicates universal or eternal fact.

Persons and things on which we depend upon for our existence is "ilah". "ilaha" i.e. female ilah belongs to the world of "Ahad-Allah", in other words the "Doonallah" i.e. the world of "Weak-Allah". "Ilahoo" i.e. male Ilah belongs to the group of "Samad-Allah".

Here there is a short "Maad" on the word not. So the meaning of the expression stands as below :—Female Ilah is not for long excepting (the teaching and help of) a male Allah—(For one who desires release from rebirth). Mohammad the praised one, the representative of (the absolute) Allah, comes as guide to mankind in all ages different in names in all regions of the world.

Mohammad is universal. A Mohammad is a praised person as a true representative of Allah having all the Divine qualities possessed by/in him.

মাওলা সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী'র (সংকলিত বাণী) হইতে এখানে উদ্ধৃত করা হল

১। মানুষের জীবন চক্র

সৃষ্টিচক্রে আবদ্ধ মানুষ যে সকল অবস্থার মধ্যে একের পর অন্য অবস্থায় আবর্তিত হইতেই আছে তাহা হইল হাশর, তারপর কেয়ামত, তারপর বিদেহী হইয়া শাস্তিমুক্ত এবং বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অল্পকাল অবস্থান করে। তারপর ক্ষণকাল পিতার ঔরসে অবস্থান গ্রহণের পর ৯/১০ মাস মাতৃগর্ভে কবরস্থ হইয়া অজ্ঞাত অন্ধকারে বাস করে। তারপর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই কবর পুনরায় হাশরে উপস্থিত হয়।

এই সকল অবস্থানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হইল হাশরকালের দীর্ঘ অবস্থান। হাশর হইতে জীবনের সকল সম্বল অর্থাৎ মুক্তিপথের পাথেয় অর্জন করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইখানেই জাহান্নাম এবং জান্নাতের কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র, মুক্তি অর্জন করিতে না পারিলে উল্লিখিত চক্রাকারে মানুষের অনন্ত দুঃখময় ভ্রমণের শেষ নাই।

২। বুদ্ধি পরিচালনার স্বাধীনতা থাকার কারণে মানুষ তাহার মনের মধ্যে আপন আমিত্ব নামক অপবিত্রতার প্রকাশই অধিক করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহার মধ্যে অবস্থিত আপন রব নিজ অভিব্যক্তি সহকারে আপন ইচ্ছামত অবাধে তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না।

৩। না বুঝিয়া কোরান পড়ার কোন মূল্যই নাই। এবং কথা বুঝিয়া লইবার পর উহা আমলের দ্বারা চরিত্রগত না করিলে তাহাকেও গাধার সঙ্গে তুলনীয় এবং অত্যাচারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহর নির্দেশের সাহায্যে নফসকে জীবন্ত করিয়া না তুলিলে তাহা নফসের প্রতি জুলুম করার সমতুল্য।

৪। রুহ জাগ্রত হইয়া দৃশ্যমান হইলে তাহাকে হুর বলে। হুরপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুর অন্য সবার জন্য দৃশ্যমান নয়। সূফী সাধক কবি লালন শাহ্ রুহকে 'অচিন পাখী' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

৫। হেরা গুহায় ধ্যান করা রসুলাল্লাহর (আ.) সর্বপ্রথম সুন্নাত। সুতরাং যে কোন সত্য প্রকাশের উৎস হইতে হইবে হেরা গুহার ধ্যান, তথা আত্মদর্শন বা সালাত। সালাত সকল মৌলিক জ্ঞানের মূল উৎস। সালাতের ফলশ্রুতি হইলঃ জাকাত, কোরবানী, সদক্বা, সিয়াম, এফতার, তালাক ইত্যাদি।

৬। সালাত না-করিবার কারণেই সৃষ্টির মধ্যে জন্মচক্রে আবদ্ধ হইয়া মানুষ বন্দীদশার লাঞ্ছনায় ভুগিতেছে। সালাতী ব্যক্তির নিকট তথা মুসল্লির নিকট এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে, যেহেতু মুসল্লি একজন মুক্তপুরুষ।

৭। মানুষের মধ্যে রূপান্তর হইতেই আছে। এই রূপান্তর ভাল দিকে, না মন্দ দিকে হইতেছে তাহাই বিচার্য বিষয়। রূপান্তর সৃষ্টি যদি আল্লাহর নূরের দিকে অর্থাৎ আল্লাহর গুণ অর্জনের দিকে করা না হয় তবে উহা মন্দ রূপান্তর। ইহার প্রভাব হইতে সরিয়া বা বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলে সম্যক গুরুর আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন।

৮। আদমকে সেজদা কর, এইরূপ না বলিয়া বলা হইয়াছে-সেজদা কর আদমের জন্য। অর্থাৎ আদমের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইতেছে আদম হওয়ার জন্য। অপরপক্ষে ফেরেস্তার মত স্বভাবের মানুষ আদমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আদমে পরিণত হইবেন। আদম সর্বকালীন একটি জাহেরী অস্তিত্বরূপে মানব সমাজে থাকিবেই। কোন একজন আদমের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত অজানা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা যায় না।

৯। সপ্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ধর্মরাশি আমাদের মস্তিস্কে আগমন করে এবং বিভিন্ন সংস্কার তৈরী করে। ধনী, গরীব, নিঃস্ব সবাই আপন আপন মস্তিস্কে যে সংস্কার জমা করে ইহাই তাহাদের মাল। এইভাবে প্রতিটি বস্তুবাদী মানুষ প্রচুর

মালের অধিকারী। একজন মুসল্লি মনের মধ্যে আগত ধর্মরাশির উপর সালাত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া ইহা দ্বারা সংস্কার উৎপন্ন হইতে দেয় না। ধর্মরাশির উপর ইহাই আল্লাহর আদেশকৃত ন্যায়-বিচার।

১০। ধর্মরাশির উপর সালাত পালন করিবার অর্থই হইল প্রতিটি ধর্ম যে সময় লইয়া মস্তিস্কে আগমন করে সেই সময়ে সেই ধর্মে মনকে ডুবাইয়া না রাখিয়া তাহাকে অণু অণু করিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং ধর্মের উপর নিজেকে ভাসাইয়া রাখা। ইহা করিতে পারিলে সেই ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য বাহির হইয়া আসে এবং সালাত পালনকারী ইহার উপর সত্যদ্রষ্টা হইয়া যায়।

১১। জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া পুরুষ গুরুগণকে কখনও জগতবাসী গ্রহণ করে নাই বরং তাঁহারা নির্যাতিত হইয়াছেন নিজেদের লোক দ্বারাই। একজন পুরুষ গুরু অনুষ্ঠান ধর্মের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

১২। আল্লাহ এক বিন্দু পরিমাণ অবিচার কাহারও কর্মের প্রতি করেন না। বরং কল্যাণকর একটি কাজ করিলে তিনি নিজ হইতে তাহা দ্বিগুণ কল্যাণপ্রসূ করিয়া উহার মানসিক মজুরী দান করেন।

১৩। মন কখন কি বলে, কোথায় ধেয়ে চলে, তার খবর মোমিন ব্যতীত অন্যেরা তো মোটেই জানে না, এমনকি আমানুগণও সে বিষয়ে যত্নবান থাকে না। এইজন্য তাহাদের মন দুনিয়ার নেশায় নেশাগ্রস্থ হইয়া থাকে। এইজন্য চেষ্টা করিয়াও তাহারা সালাতের নিকটবর্তী হইতে পারে না।

১৪। সাধক যদি তাহার গুরুর দেয়া কর্তব্য অবিরামভাবে পালন করিয়া চলেন তাহা হইলে আল্লাহ তাহার কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দিয়া থাকেন এবং শীঘ্রই তাহাকে সকল বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং আপন প্রতিনিধিত্ব দান করেন। দুনিয়াদার ব্যক্তির কর্মকান্ডের দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দান করেন না। তাহাদের কর্মই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, যদিও তাহারা জীবদ্দশায় তাহাদের ধ্বংস বিষয়ে অমনযোগী হইয়াই থাকে।

১৫। সালাত না করিলে আল্লাহর পরিচয়কে অস্বীকার করা হয় এবং এই মহাসমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে হয়। ইহা সার্বজনীন এবং সর্বকালীন একটি সত্য। সালাতী ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে অতি তৎপর এবং মানসিকভাবে কর্মঠ। অসালাতী ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে বে-খেয়াল, অলস এবং অমনোযোগী হইয়া বিষয়মোহ আপ্লুত হইয়া ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে। সালাত ও যাকাত অপেক্ষা আপাত সুখ তাহার নিকট অধিক মূল্যবান।

১৬। মানুষ মাটির মত উৎপাদনশীল। পাথরের মধ্যে যেমন কোন কিছু জন্মায় না, সাধক সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহার মধ্যে তেমনই কোন শেরেক উৎপন্ন হয় না। এইরূপে 'আল হিজর'কে অর্থাৎ বিশেষ বা প্রতিষ্ঠিত পাথরকে সিদ্ধপুরুষের বা পবিত্র পুরুষের প্রতীক করা হইয়াছে। শেরেকমুক্ত পবিত্র পুরুষগণকেই আল্লাহর জ্ঞানের আঘাত দিয়া প্রবাহিত রহমতের নদীরূপে চক্ষুষ্মান গুরুরূপে মানব জাতির হাদি বানাইয়া দেওয়া হয়।

১৭। কোন কিছুর সঙ্গে মোহের সংযোগ থাকাই শিরিক। শিরিক মানুষকে সৃষ্টিতে আনে। মানুষ আপন শিরিকের দ্বারা নিজেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। নবজাত শিশুর মধ্যে শিরিক নাই, সুতরাং সে কিছুই সৃষ্টি করে না। পরিণত মানুষই শিশুমনে শিরিকের অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং উহা দ্বারা তাহার অধঃপতন ঘটায়।

১৮। একজন মানুষ এবং তাহার অন্তরের মাঝে আল্লাহর অনুপ্রবেশ রহিয়াছে। তিনি মানুষের মনের সকল বিষয়াদির সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে পরিজ্ঞাত। সুতরাং মনের অবস্থা অনুযায়ী পরবর্তী যথাযোগ্য স্তরে তিনি মানুষকে তাঁহার দিকে হাসর করেন অর্থাৎ একত্রিত করিয়া থাকেন।

১৯। সাধকগণকে আরও নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যেন তাহারা লোকদেখানো সাধক না হয়। লোকদেখানো যে সব সাধক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসে কিন্তু তাহাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা আল্লাহ তাহাদের মধ্যে আবৃত হইয়াই থাকেন, বিকশিত হন না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী। মরার আগে না মরা পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কেহই দেহঘর ছাড়িয়া যাইতে পারে না। দেহঘর ছাড়িয়া যাওয়া লোক দেখানো বিষয় নয়।

২০। মানুষের উদ্ধারের জন্য যদি আল্লাহর তরফ হইতে একজন মানুষ না আসে তাহা হইলে লোকেরা একটা মানসিক আজাবে আক্রান্ত হইয়া যায়। সম্যক একজন শুরু আসিয়া এই আজাব দেখাইয়া না দিলে মানসিক এই আজাব সম্বন্ধে মানুষ একেবারেই অচেতন হইয়া থাকে।

২১। ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন হইতে আনন্দ লাভ করা, এবং ধনসম্পদ উপার্জনের আনন্দ লাভ করা এবং ভাল বাসস্থানের আনন্দ লাভ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি আল্লাহ, রসুল এবং তাঁহার পথে জেহাদ করা অপেক্ষা কাহারও নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধার্মিক হিসাবে ফাসেক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ), তাই সে আল্লাহর হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহর শান্তিমূলক আদেশের অপেক্ষায় তাহাকে থাকিতে হইবে।

২২। মোমিনগণ জ্বরা, ব্যাধি, দুঃখ ও মৃত্যু হইতে মুক্ত। ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি অবিরাম প্রবাহিত সত্যবোধ ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা বিদ্যমান। বিশ্বাসকারীগণ কল্যাণপ্রাপ্ত হইয়া মোমিন পর্যায়ে উন্নীত হন এবং উক্ত যোগ্যতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন।

লোকোত্তর ধর্ম

শুধু **না**-কেই জানা এবং **না**-এরই সাধনা। জাকাত জেগে উঠবে **না**-এর কঠোর সালাতে।

এবং

পরিশেষে পৌঁছে যাবে পরম **না**-তে। বিজয় আসবে জন্ম-মৃত্যুর উপর, বিজয় আসবে সর্ব দুঃখের উপর।

এই স্তরকে কোরানের পরিভাষায় **মোকামে মাহ্‌মুদা বা লা-মোকাম** অর্থাৎ **নির্বাণ** বলে।

যথায় শূণ্য তথায়ই পূণ্য তথায় দেবতাও নগণ্য। আকাশ পাতাল সব জঘণ্য জঘণ্য–স্বাধীনতা করে তারা ক্ষুন্ন।

LOKOTTAR DHARMA

Know **NOT** and practice **NOT** the zakat will arise with the salat of **NOT** and ultimately the great **NO** will be reached and victory over births and deaths; victory over all sufferings.

According to quranic terminology this stage is called **`LAA MOKAM'** that is, masterly stage of the permanent annihilation of human self.

ইমাম হোসাইন (আ.)-এঁর অমর বাণী :

সততাই সম্মান, মিথ্যা হলো অক্ষমতা, সাহায্য হলো বন্ধুত্ব, কর্ম হলো অভিজ্ঞতা, সৎব্যবহার হলো এবাদত, নির্বাক থাকাই সৌন্দর্য, নম্রতাই বুদ্ধিমত্তা, কার্পন্য দারিদ্র, দানশীলতাই প্রাচুর্য।

যাহারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারে না তাহারা কিছুই করিতে পারে না। যাহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও কোন বন্ধুর সুপরামর্শে মনকে বদলাইয়া ফেলে তাহাদিগ হইতেও ভাল কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু যাহারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের পর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিয়া কর্ম আরম্ভ করে এবং কর্ম পথে ছোট খাট বাধা বিপত্তি দ্বারা নিরস্ত হয় না তাহারাই অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাহারা আশ্চর্য বিষয়াদি সমাধা করিতে পারে।

সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী